Bigyani Sofdor Alir Moha Moha Abishkar

by

Md. Jafar Iqbal

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com

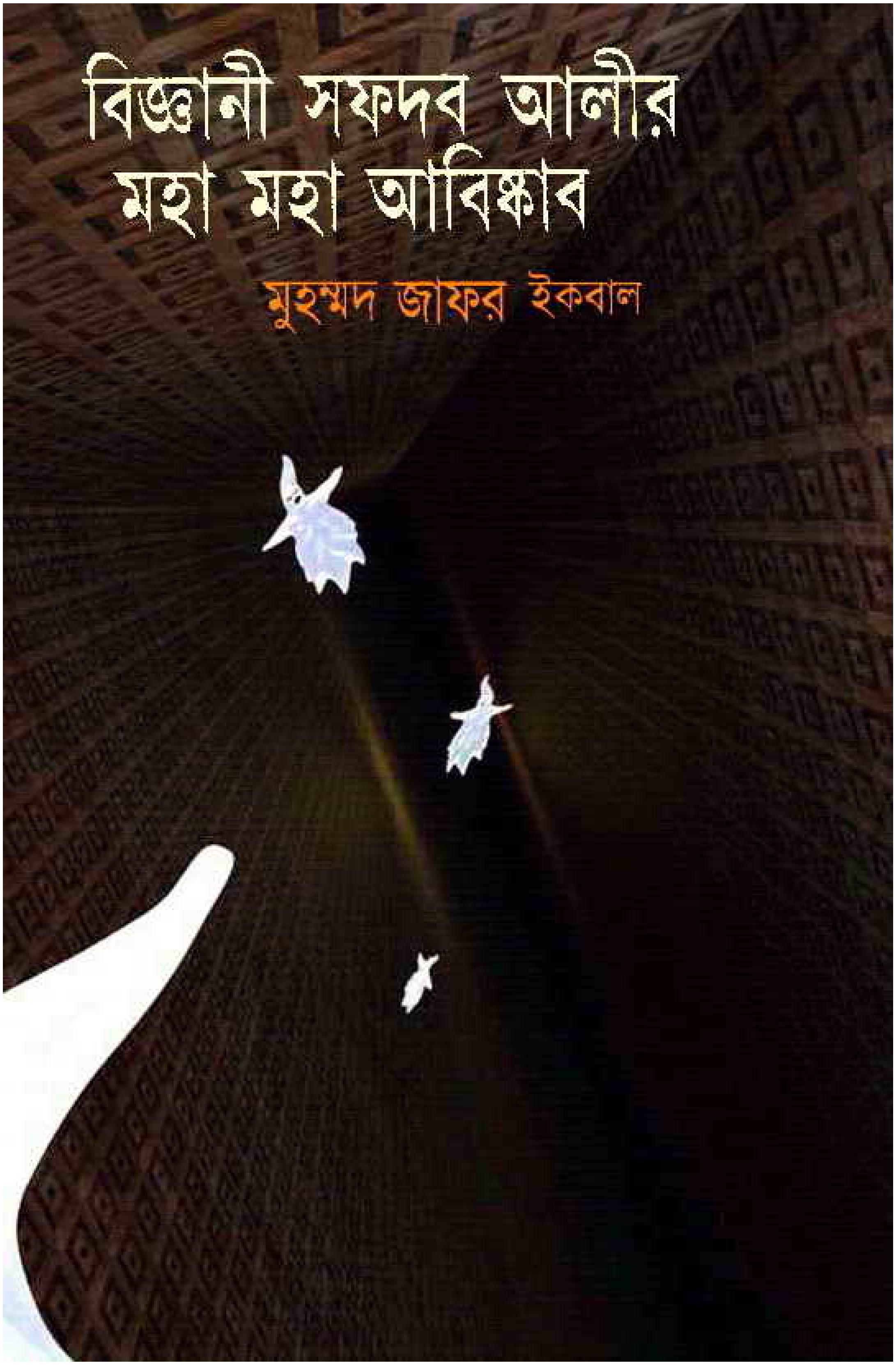
বিজ্ঞানী সফদর আলীর
মহা মহা আবিষ্কার
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কাচ্চি বিরিয়ানি

বিজ্ঞানী সফদর আলীর সাথে আমার পরিচয় জিলিপি খেতে গিয়ে। আমার জিলিপি খেতে খুব ভালো লাগে, গরম গরম মুচমুচে জিলিপি থেকে খেতে ভালো আর কী আছে? আমি তাই সময় পেলেই কাওরান বাজারের কাছে একটা দোকানে জিলিপি খেতে আসি। আজকাল আর কিছু বলতে হয় না, আমাকে দেখলেই দোকানি একগাল হেসে বলে, বসেন স্যার। আর দশ মিনিট। অর্থাৎ জিলিপি ভাজা শেষ হতে আর দশ মিনিট। দোকানের বাচ্চা ছেলেটা খবরের কাগজটা দিয়ে যায়, আমি বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি, খবরগুলো পড়ে বিজ্ঞাপনে চোখ বোলাতে বোলাতে জিলিপি এসে যায়। খেয়ে আমাকে বলতে হয় কেমন হয়েছে, ভালো না হলে নাকি পয়সা দিতে হবে না।

সেদিনও তেমনি বসেছি জিলিপি খেতে, প্লেটে গরম জিলিপি থেকে ধোঁয়া উঠছে, আমি সাবধানে একটা নিয়ে কামড় দেবার চেষ্টা করছি, এত গরম যে একটু অসাবধান হলেই জিভ পুড়ে যাবে। তখন আমার সামনে আরেকজন এসে বসলেন; ছোটখাটো শুকনা মতন চেহারা, মাথায় এলোমেলো চুল; মুখে বেমানান বড় বড় গোঁফ। চোখে ভারী চশমা দেখে কেমন যেন রাগী রাগী মনে হয়। শার্টের পকেটটি অনেক বড়, নানারকম জিনিসে সেটি ভর্তি, মনে হল সেখানে জ্যান্ত জিনিসও কিছু একটা আছে, কারণ কিছু একটা যেন সেখানে নড়াচড়া করছে! ভদ্রলোকটিও জিলিপি অর্ডার দিলেন, আমার মতন নিশ্চয়ই জিলিপি খেতে পছন্দ করেন। জিলিপি আসার সাথে সাথে তিনি পকেট থেকে টর্চ লাইটের মতো একটা জিনিস বের করলেন, সেটার সামনে কয়েকটি সুঁচালো কাঁটা বের হয়ে আছে। জিনিসটি দিয়ে তিনি একটা জিলিপি গেঁথে ফেলে কোথায় যেন একটা সুইচ টিপে দেন, সাথে সাথে ভিতরে একটা পাখা শোঁ শোঁ করে ঘুরতে থাকে, ভিতর থেকে জোর বাতাস বের হয়ে আসে। দশ সেকেন্ডে জিলিপি ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সাথে সাথে তিনি জিলিপিটা মুখে পুরে দিয়ে তৃপ্তি করে চিবুতে থাকেন। আমি অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ করছিলাম; আমার চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, জিলিপি খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

সত্যি তিনি সময় নষ্ট করলেন না, আমি দুটো জিলিপি খেয়ে শেষ করতে–করতে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

তাঁর পুরো প্লেট শেষ। সময় নিয়ে তাঁর সত্যি সমস্যা রয়েছে; কারণ হঠাৎ তাঁর শার্টের কোনো একটা পকেট থেকে একটা অ্যালার্ম বেজে ওঠে, সাথে সাথে তিনি লাফিয়ে উঠে পানি না খেয়েই প্রায় ছুটে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় পয়সা পর্যন্ত দিলেন না, হাত নেড়ে দোকানিকে কী একটা বলে গেলেন, দোকানিও মাথা নেড়ে খাতা বের করে কী একটা লিখে রাখল।

আমি বের হবার সময় দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে। দোকানি নিজেও ভালো করে চেনে না, নাম সফদর আলী। মাসিক বন্দোবস্ত করা আছে, বৃহস্পতিবার করে নাকি জিলিপি খেতে আসেন। মাথায় টোকা দিয়ে দোকানি বলল, মাথায় একটু ছিট আছে।

ছিট জিনিসটা কী আমি জানি না। কিন্তু মাথায় সেটি থাকলে লোকগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যায়; আর ঠিক এই ধরনের লোকই আমার খুব পছন্দ! কে এক সাধু নাকি দশ বছর থেকে হাত উপরে তুলে আছে শুনে আমি পকেটের পয়সা খরচ করে সীতাকুণ্ড গিয়েছিলাম। যখনই আমি খবর পাই কোনো পীর হাতের ছোঁয়ায় এক টাকার নোটকে এক শ' টাকা বানিয়ে ফেলছে, আমি সেটা নিজের চোখে দেখে আসার চেষ্টা করি। এত দিন হয়ে গেল এখনো একটা সত্যিকার পীরের দেখা পাই নি, সবাই ভণ্ড। আমার অবশ্যি তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, মজার মানুষ দেখা আমার উদ্দেশ্য, ভণ্ড পীরের মতো মজার মানুষ আর কে আছে? সফদর আলী যদিও পীর নন কিন্তু একটা মজার মানুষ তো বটেই! তাই সফদর আলীকে আবার দেখার জন্যে পরের বৃহস্পতিবার আমি আবার সেই দোকানে গিয়ে একই টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে থাকি।

ঠিকই সফদর আলী সময়মতো হাজির। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি, চশমার কাচের উপর গাড়ির ওয়াইপারের মতো ছোট ছোট দু'টি ওয়াইপার শাঁই শাঁই করে পানি পরিষ্কার করছে। দোকানের ভিতরে ঢুকে কোথায় কী একটা সুইচ টিপে দিতেই ওয়াইপার দু'টি থেমে গিয়ে উপরে আটকে গেল। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে হেসে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, বৃষ্টিতে চশমা ভিজে গেলে কিছু দেখা যায় না কিনা!

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কোথায় পেলেন এরকম চশমা?

পাব আর কোথায়, নিজে তৈরি করে নিয়েছি।

আমি তখনই প্রথম জানতে পারলাম, সফদর আলী আসলে এক জন শখের বিজ্ঞানী। কথা একটু কম বলেন, একটু লাজুক গোছের মানুষ, কিন্তু মজার মানুষ তো বটেই! আমি তাঁর কাপড়ের দিকে লক্ষ করে বললাম, একেবারে তো ভিজে গেছেন, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

না, ঠাণ্ডা লাগবে না, বলে পকেটে আরেকটা কী সুইচ টিপে দিলেন। একটু পরেই তাঁর কাপড়-জামা থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে কাপড় একেবারে শুকনো খটখটে। সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী-একটা টিপে আবার সুইচ বন্ধ করে দিলেন। আমার বিস্মিত ভাবভঙ্গি দেখে আবার কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কাপড়ের সুতার মাঝে মাঝে নাইক্রোম ঢুকিয়ে দিয়েছি, যখন

খুশি গরম করে নেয়া যায়। পকেটে ব্যাটারি আছে।

সফদর আলী আবার জিলিপি অর্ডার দিলেন। আজকেও টর্চ লাইটের মতো দেখতে সেই ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খুব তাড়াহুড়া নেই। আমি তাই আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম, প্রায়ই আসেন বুঝি এখানে?

না, শুধু বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার ছুটি কিনা!

কোনো অফিস বৃহস্পতিবার ছুটি হয় আমি জানতাম না, তাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী অফিস এটা যে বৃহস্পতিবারে আপনার ছুটি?

না না, আমার ছুটি নয়! বৃহস্পতিবার আমি ছুটি দিই।

কাদের ছুটি দেন?

এই, আমার একধরনের ছাত্রদের বলতে পারেন। সফদর আলী একটু আমতা আমতা করে থেমে গেলেন, ঠিক বলতে চাইছেন না, তাই আমি আর তাঁকে ঘাঁটালাম না।

সফদর আলী খুব মিশুক নন, তবে কথাবার্তা বলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কথা হল। অনেক কিছু জানেন আর মাথায় অনেক ধরনের পরিকল্পনা, তাই তাঁর কথা শুনতেই ভারি মজা! ব্যাঙের ছাতার চাষ করে কী ভাবে খাদ্য সমস্যা মেটানো যায় বা কেঁচো পুষে কী ভাবে ঘরের আবর্জনা দূর করা যায়, সে থেকে শুরু করে সংখ্যা কেন দশভিত্তিক না হয়ে ষোলভিত্তিক হওয়া দরকার—এধরনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ। সংখ্যা ষোলভিত্তিক হলে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করা নাকি খুব সহজ হবে, আজকাল সব মাইক্রোপ্রসেসর নাকি ষোল কিংবা বত্রিশ বিটের হয়, সেটার মানে কী, আমি জানি না। সফদর আলী বলেছেন, আমাকে আরেক দিন বুঝিয়ে দেবেন। তিনি নিজে সবসময়েই ষোলভিত্তিক সংখ্যায় হিসেব করেন, তাই তিনি গোনেন খুব অদ্ভুতভাবে। সাত, আট, নয়ের পর দশ না বলে বলেন কুরা। তারপর কিলি, চিংগা, পিরু, মিকা, ফিকার পরে নাকি আসে দশ! আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তিনি যখন দশ বলেন তার অর্থ নাকি ষোল! তিনি যখন বলেন এক শ', তার অর্থ নাকি দুই শ' ছাপ্পান্ন! ব্যাপারটি যে ফাজলামি নয় সেটা আমি জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের প্রফেসরের সাথে কথা বলে, সত্যি নাকি এ ধরনের সংখ্যা হওয়া সম্ভব!

পরের বৃহস্পতিবার আবার সফদর আলীর সাথে দেখা। তাঁকে একটু চিন্তিত দেখা গেল। গিনিপিগের লোমে তেল-হলুদ লেগে গেলে সেটা কী ভাবে পরিষ্কার করা যায় বা লোম পুড়ে গেলে পোড়া গন্ধটা দূর করা যায় কী ভাবে জানি কি-না জিজ্ঞেস করলেন। খুব সঙ্গত কারণেই আমি সেটা জানতাম না, গিনিপিগের লোমে তেল-হলুদ লাগতে পারে কী ভাবে কিংবা পুড়ে যেতে পারে কী ভাবে, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় এল না। তিনি কি শেষ পর্যন্ত গিনিপিগ রান্না করে খাওয়া শুরু করেছেন নাকি?

আজ কথাবার্তা খুব বেশি জমল না। কী যেন চিন্তা করে একটা কাগজে অনেকগুলো দাগ টেনে একটা দাগ আরেকটার সাথে জুড়ে দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। আমি তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না, আমার নিজেরও কাজ ছিল, তাই উঠে পড়ার উদ্যোগ করতেই সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন?

আমি? বিরিয়ানি? আমি মাথা নেড়ে জানালাম, রাঁধতে পারি না, শুধু খেতে পারি।

সফদর আলীর মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল দেখে বললাম, আমার বোন থাকে শান্তিনগরে, সে খুব ভালো কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধতে পারে।

সফদর আলী খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বোনকে বলবেন একটা কাগজে লিখে দিতে? বুঝলেন কিনা, করব যখন ভালো করেই করি!

কী করবেন?

সফদর আলী আমতা আমতা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কবে দরকার আপনার বিরিয়ানির রেসিপি?

কাল দিতে পারবেন?

কোথায় দেব?

এইখানে।

আমার তাঁর বাসাটা দেখার ইচ্ছে, তাই বললাম, আপনার বাসাতে নিয়ে আসতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সফদর আলী একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন। একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন, শ্যামলীর কাছে কোথায় জানি থাকেন।

পরদিন আমি ঠিকানা খুঁজে সফদর আলীর বাসা বের করলাম। একটু নির্জন এলাকায় বেশ বড় একটা একতলা বাসা। দরজায় বেল টিপতেই ঘেউ-ঘেউ করে একটা কুকুর ভয়ানক রাগী গলায় চিৎকার করতে থাকে। কুকুরকে আমার খুব ভয় করে, আমি তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে আসি। সফদর আলী দরজা একটু ফাঁক করে নিজের মাথাটা বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এনেছেন?

আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়তো ভিতরে বসতে বলবেন, কিন্তু তার সেরকম ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। বদরাগী কুকুরটার ডাক শুনে আমার নিজের ইচ্ছেও কমে এসেছে, তাঁর হাতে কাগজটা দিয়ে চলে এলাম। আসার আগে দরজার ফাঁক দিয়ে একটু উঁকি মারার চেষ্টা করে মনে হল মেঝেতে ইঁদুরের মতো অনেকগুলো কী যেন ঘোরাঘুরি করছে। গিনিপিগের কথা বলছিলেন, তাই হবে হয়তো।

পরের বৃহস্পতিবার সফদর আলীকে খুব খুশি খুশি দেখা গেল। নিজে থেকে আলাপ শুরু করলেন, বললেন, বুঝলেন ইকবাল সাহেব, আমার কাজ প্রায় শেষ। এখন লবণ একটু কম হয়, কিন্তু এমনিতে ফার্স্ট ক্লাস জিনিস!

কিসে লবণ কম হয়?

কেন, বিরিয়ানিতে! মনে নেই আপনি রেসিপি এনে দিলেন?

ও! আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজেই রাঁধছেন বুঝি?

মাথা খারাপ আপনার, আমি রাঁধব? রান্না করা আমার দু'চোখের বিষ!

তাহলে কি ভালো বাবুর্চি পেয়েছেন নাকি?

সফদর আলী হা হা করে হাসলেন, বাবুর্চি বলতেও পারেন ইচ্ছা করলে। গিনিপিগ বাবুর্চি!

মানে?

আমার রান্না করে দেয় গিনিপিগেরা!

আমি গরম চা খাচ্ছিলাম, বিষম খেয়ে তালু পুড়ে গেল। মুখ হাঁ করে খানিকক্ষণ বাতাস টেনে জিজ্ঞেস করলাম, কী বললেন! গিনিপিগেরা?

হুঁ! সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, এত অবাক হচ্ছেন কেন, ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়, একটু সময় লাগে আর কী!

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সফদর আলী আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কিনা। এমনিতে অবশ্যি তিনি ঠাট্টা–তামাশার মানুষ নন, কিন্তু তাই বলে গিনিপিগ রান্না করছে সেটা বিশ্বাস করি কী ভাবে? সফদর আলী আমার অবিশ্বাসের দৃষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কম্পিউটারে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হয় কি–না?

আমি মাথা নাড়লাম, হয়।

কী ভাবে হয়?

আমি জানতাম না, তাই চুপ করে থাকলাম। সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কম্পিউটার কখনোই একটা কঠিন সমস্যা একবারে করে না। সেটাকে আগে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেয়া হয়, তাকে বলে প্রোগ্রাম করা। প্রত্যেকটি ছোট ছোট অংশ আলাদা আলাদাভাবে খুব সহজ। কিন্তু সবগুলো একত্র হয়ে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়। রান্না করার ব্যাপারটাও তাই, পুরো রান্না ব্যাপারটা অনেক কঠিন, কিন্তু রান্না করাকে যদি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলা হয়, তা হলে সেই ছোট অংশগুলো কিন্তু মোটেও কঠিন নয়, যেমন একটা ডেকচি চুলোর উপরে রাখা বা ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢালা বা ঘি–এর মাঝে তেজপাতা ছেড়ে দেয়া—এই ছোট ছোট কাজগুলো যে কেউ করতে পারবে, একটু কষ্ট করে গিনিপিগকে শিখিয়ে দিলে একটা গিনিপিগও করতে পারবে।

সফদর আলী থামলেন। আর আমার মনে হল আমি খানিকটা বুঝতে পারছি তিনি কী ভাবে গিনিপিগকে দিয়ে রান্না করিয়ে নিচ্ছেন। আমার তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি, তাই সফদর আলী আবার শুরু করলেন, আমি করেছি কী, অনেকগুলো গিনিপিগকে নিয়ে তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা জিনিস করতে শিখিয়েছি। যেমন একটা গিনিপিগ একটা ডেকচি ঠেলে চুলোর ওপরে তুলে দেয়, সে আর কিছুই পারে না। যখনই একটা ঘন্টা বাজে তখনই সে ঠেলে ঠেলে একটা ডেকচি চুলোর উপরে তুলে দেয়। সেটা শেখানো এমন কিছু কঠিন না—দু'দিন এক ঘন্টা করে শেখাতেই শিখে গেল। এর পরের গিনিপিগটা শুধু চুলোটা জ্বালিয়ে দেয়, সেটা শেখানো একটু কঠিন হয়েছিল, প্রথম প্রথম লোম পুড়ে যেত, এখন সাবধান হয়ে গেছে, আর লোম পোড়ে না। চুলো ধরে যাবার পর তিন নম্বর গিনিপিগটা এসে ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢেলে দেয়, তার পরই তার ছুটি। এরকম সব মিলিয়ে চিচিংগাইশটা গিনিপিগ আছে—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চিচিংগাইশ মানে কি?

ও, চিচিংগাইশ হচ্ছে দুই আর কিলি, তার মানে ষোল দু'গুণে বত্রিশ যোগ কিলি, তার মানে আপনাদের তেতাল্লিশ! যাই হোক এই তেতাল্লিশটা গিনিপিগ তেতাল্লিশটা ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কাজ করে, সবগুলো যখন শেষ হয় তখন চমৎকার এক ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে যায়। সফদর আলী কথা শেষ করে একটু হাসলেন।

কিন্তু যদি গিনিপিগগুলো উল্টোপাল্টা করে ফেলে, ঘি গরম হবার আগেই যদি চাল ঢেলে দেয়?

করবে না, এক জন শেষ করার আগে আরেকজন শুরু করবে না। প্রথম গিনিপিগ তার কাজ শেষ করে দ্বিতীয়টার পেটে একটা খোঁচা দেয়, এই খোঁচা না খাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়টা তার কাজ শুরু করবে না। সব ট্রেনিং দেয়া আছে।

আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। সফদর আলী যেটা বলেছেন, সেটা অসম্ভব হয়তো নয়, কিন্তু তাই বলে তেতাল্লিশটা গিনিপিগ হৈচৈ করে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমার অবিশ্বাসের ভঙ্গি দেখে সফদর আলী বললেন, আপনার বিশ্বাস হল না? আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে লেজ ধরে একটা নেংটি ইঁদুর বের করলেন, আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল সফদর আলী পকেটে করে জ্যান্ত কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! ইঁদুরটা টেবিলে রাখামাত্র পাশের টেবিলের এক জন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, সে ভেবেছে খাবার থেকে ইঁদুর বেরিয়েছে। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করা হল, কিন্তু সফদর আলী আমাকে আর দেখাতে পারলেন না, ইঁদুরটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন পরদিন বিকালে তাঁর বাসায় যেতে। আমাকে গিনিপিগের বিরিয়ানি রান্না দেখাবেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে শুনলাম জরুরি কাজে আমাকে তক্ষুনি চট্টগ্রাম যেতে হবে। আমাদের কোম্পানির এক জন ম্যানেজার নাকি অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আমাকে অফিস থেকে সোজা এয়ারপোর্ট যেতে হল, বাসায় এক জন খবর পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলাম দু'তিন দিন লাগবে, কিন্তু সেই ম্যানেজার এমনই ঝামেলা করে রেখেছিল যে পুরো দুই সপ্তাহ লেগে গেল। ঢাকায় ফিরে এসে ভাবলাম, সফদর আলীর সাথে দেখা করি। কিন্তু অফিসে ছিলাম না বলে এত কাজ জমে গিয়েছিল যে সময় পেতে পেতে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সময় করে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে তাঁকে পেলাম না। বেল টিপতেই কুকুরটা এমন ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল যে আমি আর অপেক্ষা করার সাহস পেলাম না। জিলিপির দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সফদর আলী অনেকদিন হল সেখানে আর যান না। পরে কয়েকবার তাঁর বাসায় গিয়েছি, তাঁর দরজায় চিঠি লিখে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেন নি। আমাকে কয়েকদিনের ভেতরে আবার খুলনা যেতে হল, সেখানকার ম্যানেজারও নাকি কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। খুলনা থেকে গেলাম রাজশাহী, সেখান থেকে বগুড়া হয়ে ঢাকা। ঢাকায় ফিরে এসেও প্রথম-প্রথম অনেক ব্যস্ত ছিলাম, সপ্তাহখানেক পরে খানিকটা সময় পেয়ে ভাবলাম, সফদর আলীর বাসা থেকে ঘুরে আসি।

শ্যামলী আসার অনেক আগেই আমি বাতাসে বিরিয়ানির গন্ধ পেলাম। কাছাকাছি আসতেই মানুষের হৈচৈ শোনা যেতে লাগল। আরো কাছে গিয়ে দেখি সফদর আলীর বাসার চারপাশে অনেক লোকজন বসে বসে বিরিয়ানি খাচ্ছে, গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারলাম, আমার বোনের রেসিপি! লোকজন হাতে থালা-বাসন নিয়ে লাইন ধরে সফদর আলীর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না, এর

মাঝে দরজা একটু ফাঁক করে সফদর আলী বের হয়ে এলেন, হাতে এক ডেকচি গরম বিরিয়ানি। লোকজনকে বিরিয়ানি ভাগ করে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাকলাম। সফদর আলী ঘুরে আমাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, ছুটে এসে আমার হাত ধরে বললেন, ইকবাল সাহেব, তাড়াতাড়ি আসেন! আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে!

সফদর আলীকে চেনা যায় না, চুল উশকোখুশকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার?

ভেতরে আসেন, তাহলেই দেখবেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনার কুকুরটা বেঁধে রেখেছেন তো!

কুকুর? কিসের কুকুর?

সেই যে আপনার বাসায় বেল টিপতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে!

ও! সফদর আলী দুর্বলভাবে হাসলেন, মানুষজনকে ভয় দেখানোর জন্যে কুকুরের ডাক টেপ করা আছে। বেল টিপতেই বেজে ওঠে! কুকুর পাব কোথায় আমি?

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল! আমি সফদর আলীর সাথে ভেতরে ঢুকলাম, ভেতরে বেশ অন্ধকার। খানিকক্ষণ লাগল অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে, তারপর আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে পেলাম। ঘরের মাঝে সারি সারি গ্যাসের চুলা, তার মাঝে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, রান্না করছে শত-শত গিনিপিগ! গিনিপিগগুলো ছোটাছুটি করছে, কেউ ঠেলে ঠেলে ডেকচি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘি ঢালছে, কেউ পেঁয়াজ কাটছে, কেউ নেড়ে দিচ্ছে, কেউ চাল ঢেলে দিচ্ছে—সে এক এলাহি কাণ্ড! ঘর বিরিয়ানির গন্ধে ম' ম' করছে! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটি সামলে আমি কোনোমতে এক পাশে সরে এসে গিনিপিগদের দেখতে থাকি! সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, মহা বিপদে পড়েছি।

কি বিপদ?

দেখছেন না! দিন-রাত গিনিপিগেরা শুধু বিরিয়ানি রান্না করে যাচ্ছে!

কেন? আপনি না বলেছিলেন তেতাল্লিশটা গিনিপিগ, এখানে তো মনে হয় তেতাল্লিশ শ'!

তেতাল্লিশটাই তো ছিল, কিন্তু মাঝে বাচ্চা হল সবার। আমার বাচ্চা বাড়ানোর ওষুধটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তাতে অল্প সময়ে সবগুলোর নাতি-পুতি হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় চার শ' গিনিপিগ।

মোটে চার শ'? দেখে তো মনে হচ্ছে লাখখানেক।

আপনাদের হিসেবে প্রায় এক হাজার, আমার হিসেব ষোলভিত্তিক, তাই আমার এক শ' হয় দু'শ ছাপ্পান্নতে!

এই সবগুলোকে আপনি বসে-বসে রান্না শিখিয়েছেন?

মাথা খারাপ আপনার? বাচ্চাগুলো নিজে-নিজে মা-বাবাদের দেখে-দেখে শিখে গেছে। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, এখন সবাই রান্না করতে জানে, আর মুশকিল হচ্ছে এরা দিন-রাত শুধু রান্নাই করে যাচ্ছে, দিনে ত্রিশ-চল্লিশ বার রান্না হচ্ছে! কী ভাবে থামাই বুঝতে পারছি না।

কেন?

একবার ডেকচিগুলো কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম, সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করল। কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি!

আমি গিনিপিগগুলো দেখেই বুঝতে পারলাম সমস্যাটি সহজ নয়, এতগুলো গিনিপিগকে থামানো কঠিন, সবাই যদি একটু করে খামচে দেয়, শরীরের চামড়া উঠে যাবে। আমার হঠাৎ মনে পড়ল সফদর আলী বলেছিলেন, তিনি প্রথমে একটা ঘন্টা বাজাতেন, তখন রান্না শুরু হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, আপনার সেই ঘন্টাটি কোথায়?

ঐ যে, তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। আশেপাশে কয়েকটা গিনিপিগ ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে-মাঝে একটা এসে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়, আর নতুন রান্না শুরু হয়ে যায়!

আপনি তো বলেছিলেন ঘন্টাটা আপনি নিজে বাজাতেন?

প্রথমে তাই বাজাতাম, আমাকে দেখে-দেখে এখন নিজেরাই শিখে নিয়েছে, যখন খুশি বাজিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক ঘন্টা, বাজানোর খুব সুবিধে!

আমি সাবধানে ঘন্টাটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতেই প্রায় ত্রিশটা গিনিপিগ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি লাফিয়ে কোনোমতে সরে এলাম!

সফদর আলী ছুটে এসে বললেন, সর্বনাশ! ওদের ঘাঁটাবেন না, মাংস শেষ হয়ে আসছে, আপনাকে কেটে বিরিয়ানির মাঝে দিয়ে দেবে!

আমি ঢোক গিলে বললাম, ঘন্টা বাজতেই যখন রান্না শুরু হয়, তখন ঘন্টা বাজানোটা বন্ধ করলেই তো সব বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টাটা কোনোমতে সরিয়ে ফেললেই হয়।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন! কী বোকা আমি, একবারও এই সহজ জিনিসটা মনে হয় নি! ইলেকট্রিক ঘন্টা এটা, প্লাগ টেনে খুলে ফেললেই হবে, ঘন্টাটা সরাতেও হবে না! সফদর আলী ছুটে গিয়ে প্লাগটা টেনে খুলে ফেললেন!

সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে নতুন রান্না শুরু হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেসব রান্না আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল গিনিপিগেরা সেগুলো শেষ করে গুটিগুটি নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। নিশ্চয়ই সেরকম ট্রেনিং দেয়া আছে। যে কয়টি গিনিপিগ ঘন্টা বাজানো শিখে নিয়ে এই দুর্গতির সৃষ্টি করেছে শুধু তারাই ঘোরাঘুরি করতে থাকে, একটু পরে পরে এসে ঘন্টা বাজানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্লাগ খুলে নেয়ায় আর শব্দ হয় না। একসময়ে সেগুলোও তাদের ঘরে ফিরে গেল, সফদর আলী দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এলেন।

ছয় ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে আছে। আমরা সেগুলো বাইরে বিতরণ করে দিয়ে এলাম। কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, কাল কখন আসবে। সফদর আলী যখন বললেন, আর আসতে হবে না—তারা বেশ অবাক হল। এক জন তো একটু রেগেই গেল মনে হল, সে নাকি দেশে চিঠি লিখে দিয়েছে, তার পরিবারের অন্য সবার আজ রাতে পৌঁছে যাবার কথা! সে এখন কী করবে সফদর আলীর কাছে জানতে চাইল, সফদর আলী কিছু বলতে পারলেন না! দরজায় তালা মেরে আমাকে নিয়ে একটা রিকশা নিলেন, অনেকদিন জিলিপি খাওয়া হয় না, আজ জিলিপি খাওয়া হবে।

শেষ খবর অনুযায়ী সফদর আলী তাঁর এক হাজার গিনিপিগকে জমি চাষ করা শেখাচ্ছেন। তাঁর বাসার পিছনে খালি জায়গা আছে, সেখানে নাকি তারা আলু, ফুলকপি আর টমেটো লাগাচ্ছে! একটু বড় হলেই আমাকে দেবেন বলেছেন। আমি অপেক্ষা করে আছি। আজকাল সবজির যা দাম!

জংবাহাদুর

সদরঘাটে পুরানো লোহা-লক্কড়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমার দেখা, মোটা লোহার হাতলের মতো দেখতে বিদঘুটে একটা জিনিস দরদাম করছিলেন। এরকম একটা জিনিস মানুষের কোনো কাজে লাগতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ভীষণ চমকে ঘুরে তাকালেন, আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি আরো ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

সফদর আলী কথা শেষ না করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, বললেন, নাহ্, কিছু না।

সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন দেখে আমি আর ঘাঁটালাম না। তাঁকে কেমন জানি একটু উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে, চেহারায় কেমন একটু উড়ো উড়ো ভাব, ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাম হাতের বুড়ো আঙুলে একটা ব্যান্ডেজ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আঙুলে কী হল?

আর বলবেন না, কিকুলমুকাসের স্ক্রু লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা মশা কামড় দিল ঘাড়ে, একটু নড়তেই ডালাটা খুলে এসে বুড়ো আঙুলটাকে থেঁতলে দিয়েছে।

কিকুলমুকাস কী জিনিস জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলী আমাকে হাতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কুড়ি টাকা চাইছে, নিয়ে নেব নাকি, কী বলেন আপনি?

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, মাথা খারাপ আপনার? কুড়ি টাকা এই বিদঘুটে হাতলটার জন্যে? আমাকে তো কেউ বিনে পয়সায় দিলেও এটা নেব না! চলেন, চলেন এখান থেকে—আমি তাঁকে সেখানে থেকে টেনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

দোকানি আমার কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ন হল বলে মনে হল; বলল, কী বলেন স্যার, খাঁটি আমেরিকান স্টিল, ডাভা মারলেও কিছু হবে না। ফাইটিং প্লেনের পার্টস, কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছিলাম। নেন, না হয় আরো দুই টাকা কম দেবেন।

সফদর আলী চোখ ছোট করে গলা নামিয়ে দোকানিকে বললেন, ফাইটিং প্লেন কেউ কখনো লোহা দিয়ে বানায়? অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর টাংস্টেন, জিনিসটা হালকা করতে হবে না? সেন্টার অব গ্র্যাভিটি যদি ঠিক না থাকে জিনিসটার ব্যালেন্স হবে কী ভাবে?

দোকানি কিছু না বুঝে একটু অপ্রস্তুতের মতো হাসল। সফদর আলী আরো কী

বলতে চাইছিলেন, আমি কোনোমতে তাঁকে টেনে সরিয়ে আনি। সদরঘাটের ভিড় বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সফদর আলী কী যেন চিন্তা করতে থাকেন, আমি তাঁকে বিরক্ত করলাম না। খানিকক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই, হঠাৎ একসময় ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষের ডিজাইনটা আসলে ঠিক হয় নি।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, কি বললেন?

মানুষের ডিজাইন, খুবই দায়সারা ডিজাইন।

মানে?

যেমন ধরেন এই হাতের ব্যাপারটা, মোটে দুইটা হাতে কি কিছু হয়? একটা মানুষের অন্তত চারটা হাত থাকা উচিত ছিল।

চারটা হাত?

হ্যাঁ। দুইটা হাতে কিছুই হয় না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, চারটা হাতের কী দরকার? আমার তো দুইটা হাতেই বেশ চলে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় একবার নাটক করতে স্টেজে উঠেছিলাম—বিবেকের পার্ট, তখন দুই হাত নিয়েই কী মুশকিল, কোথায় নিয়ে লুকাই, কী করি! চার হাত হলে যে কী সর্বনাশ হত।

বাচ্চা ছেলেদের কথা শুনে বড়রা যেভাবে হাসে, সফদর আলী সেভাবে একটু হেসে বললেন, কী যে আপনি বলেন! কখনো সল্ডারিং করেছেন?

না।

করলে বুঝবেন। সল্ডার করার সময় এক হাতে জিনিসটা ধরতে হয়, আরেক হাতে সল্ডারিং আয়রন। ব্যস, দুই হাতই শেষ, সল্ডার ধরবেন কী দিয়ে? যদি চারটা হাত থাকত তা হলে তিন নম্বর হাত দিয়ে সল্ডার ধরা যেত।

কিন্তু আপনি তো চারটা হাতের কথা বলছেন।

হ্যাঁ, চার নম্বর হাত হচ্ছে চুলকানোর জন্যে। লক্ষ করে দেখেছেন, যখন কোনো কাজে দুই হাতই ব্যস্ত থাকে তখন সবসময় নাকের ডগা চুলকাতে থাকে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে ব্যাপারটি সত্যি এবং চুলকানোর জন্যে একটা বাড়তি হাত থাকা আসলে মন্দ ব্যবস্থা নয়।

সফদর আলী তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে বললেন, যদি আমার চারটা হাত থাকত, তাহলে আমি তিন নম্বর হাত দিয়ে কিকুলমুকাসের ডালাটা ধরে রাখতে পারতাম। যখন মশাটা এসে কামড় দিল তখন চার নম্বর হাত দিয়ে কষে দিতে পারতাম একটা থাবড়া।

সফদর আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মশার জন্যে, না চার নম্বর হাত নেই সেই দুঃখে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি চার হাতের একটা মানুষ কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হল না, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাকি দুটো হাত থাকবে কোথায় সফদর সাহেব?

কেন, বগল থেকে বেরিয়ে আসবে।

আমি কল্পনা করলাম আমার বগল থেকে আরো দুটো হাত বেরিয়ে আসছে, কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বাড়তি হাত দুটোতে যে পাঁচটা করে আঙুল থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই; সফদর আলী গম্ভীর হয়ে বললেন, দুটো করে থাকলেই হয়, নখ কাটতে তা হলে বেশি সময় নষ্ট হবে না।

যখন নিজেকে মোটামুটি বিশ্বাস করিয়ে এনেছি যে সত্যি মানুষের চারটা হাতের দরকার, তখন হঠাৎ আমার অন্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল, একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কথাটা আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু—

দুই আঙুলের কথা তো, আমি—

না, আমি চার হাতের কথা বলছিলাম। আপনার কথা ঠিক, চার হাত হলে কাজকর্মে অনেক সুবিধে, কিন্তু চারটা হাতই যে একজন মানুষের হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

মানে?

আপনি খুঁজে পেতে একটা সহকারী নিয়ে নেন, তাহলেই আপনাদের দু'জনের মিলে চারটা হাত হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছেন, সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে যায় আর তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সহকারী নেয়া যাবে না।

কেন?

সফদর আলী গলা এত নামিয়ে আনলেন যে কথা প্রায় শোনা যায় না, ফিসফিস করে বললেন, অনেক গোপন জিনিসের উপর গবেষণা করি তো, জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই যে কিকুলমুকাসের কথা বলছি, সেটা যদি কেউ জেনে ফেলে, কী সর্বনাশ হবে আপনি জানেন?

সফদর আলী এত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন যে দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। এরপর আর কথাবার্তা জমল না, তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ছেন আমি পিছু-পিছু হাঁটছি—এরকম আর কতক্ষণ চলতে পারে? নবাবপুরের মোড়ে এসে আমি একটা বাস নিয়ে নিলাম, সফদর আলী যাত্রাবাড়ির দিকে রওনা দিলেন, সেখানে তাঁর নাকি কি দরকার।

দু' দিন পরের কথা। বিকেলে বাসায় এসে শুনি আমার নাকি একটা টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামে জরুরি কিছু আছে ভেবে ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে সেটা খুলে ফেলেছে, কিন্তু পড়ে এখন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারার কথা নয়। কারণ টেলিগ্রামে লেখা :

> *চার হাতের প্রয়োজন নাই। দুই হাত এবং দুই হাত যথেষ্ট।*
> *আপনি ঠিক। কিন্তু সহকারী নয়। সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা সাতটা।*

নিচে কোনো নাম লেখা নেই, কিন্তু বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না এটা কার কাজ। টেলিগ্রাম করতে তাঁকে বাসে কিংবা রিকশায় যত দূর যেতে হয়েছে, বাসার দূরত্ব তার

অর্ধেকও নয়, কিন্তু তাঁকে সেটা কে বোঝাবে? বাসার সবাই জানতে চাইল ব্যাপারটা কি, আমি বোঝালাম আমার এক বন্ধুর রসিকতা। আমার বন্ধুদের সম্পর্কে বাসার সবার খুব উচ্চ ধারণা আছে সেরকম দাবি করব না, কাজেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে বেশি বেগ পেতে হল না।

সাতটার সময় কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে হাজির হয়ে দেখি সফদর সাহেব টেবিলে একটা কাগজ বিছিয়ে সেখানে কী যেন একটা আঁকিজুকি করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা ভাঁজ করে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। আমি পাশে গিয়ে বসতেই গলা নামিয়ে বললেন, বানর, বানর হচ্ছে সমাধান!

কী বললেন?

বললাম বানর।

বানর? কিসের বানর?

কিসের আবার হবে, সফদর আলী একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, আমার একটা বানর দরকার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বানর দিয়ে কী করবেন?

আপনি বলছিলেন না সহকারীর কথা? বানর হবে আমার সহকারী। আগে শুধু একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন? আমি উচ্চস্বরে হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম, আমার হঠাৎ গিনিপিগকে দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করার কথা মনে পড়ে গেল। সফদর আলী যদি গিনিপিগকে দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করিয়ে নিতে পারেন, কে জানে সত্যিই হয়তো বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে সহকারী বানিয়েও নিতে পারবেন। তবু ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না, একটু কেশে বললাম, বানরকে দিয়ে কী কী কাজ করানোর কথা ভাবছেন?

কঠিন কিছু নয়, সহজ কাজ। এই সকালে দু'টি রুটি টোস্ট করে এককাপ চা তৈরি করে দেবে, ঘরদোর একটু পরিষ্কার করবে, দুপুরে চিঠিপত্রগুলো আনবে— এইসব ছোটখাট কাজ।

আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, সফদর আলী বসে আছেন আর একটা বানর তাঁর জন্যে কড়া লিকারের চা তৈরি করছে!

আসল কাজ অবশ্যি আমার গবেষণা, সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বানরকে দরকার সেজন্যে।

বানরের উপর গবেষণা?

না না, বানরের উপর আর নতুন কী গবেষণা হবে, সে তো প্রায় শেষ। আমি আমার নিজের গবেষণার কথা বলছি। বানর আমার গবেষণায় সাহায্য করবে, সে হবে আমার বাড়তি দুই হাত। মনে করেন কিকুলমুকাসটা খুলতে চাই, বলব, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো—

বান্দর আলী?

সফদর আলী লাজুকভাবে হেসে বললেন, নামটা খারাপ হল?

না না, খারাপ হবে কেন, চমৎকার নাম! আমি হাসি গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, পশুপাখিকে এভাবে কাজকর্ম শেখানো কি খুব কঠিন নাকি?

সেটা নির্ভর করে কী ধরনের পশু তার উপর, সফদর আলী একটা লম্বা বক্তৃতা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন, যদি ম্যামেল বা স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়, তা হলে খুবই সহজ। ম্যামেলদের ভেতরে বানরের বুদ্ধি আবার অন্যদের থেকে বেশি, কাজেই বানরকে শেখানো একেবারে পানিভাত। পদ্ধতিটা হচ্ছে পুরস্কার পদ্ধতি, ট্রেনিং দেবার সময়ে যখনি একটা কাজ ঠিকভাবে করে তখনি পুরস্কার দিতে হয়। মনে করেন আপনি একটা বানর, আমি আপনাকে বললাম, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো। আপনি তখন আমার কথা কিছু না বুঝে লাফ-ঝাঁপ দেয়া শুরু করবেন। আমি তখন চেষ্টা করব আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারের কাছে নিয়ে যেতে। লাফ-ঝাঁপ দিতে দিতে হঠাৎ যদি ভুলে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ছুঁয়ে ফেলেন, সাথে সাথে আপনাকে পুরস্কার হিসাবে একটা কলা দেব। এরকম কয়েকবার যদি করি তখন আস্তে আস্তে আপনি বুঝতে পারবেন স্ক্রু-ড্রাইভার কথাটা শুনে আপনি যদি স্ক্রু-ড্রাইভারটা গিয়ে ধরেন, তা হলে আপনি একটা কলা পাবেন। কলার লোভে এরপরে যখনই আমি বলব স্ক্রু-ড্রাইভার, আপনি ছুটে যাবেন স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরতে। এভাবে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরলেই আপনাকে একটা কলা দেব, কিন্তু পরে কলা পেতে হলে আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা?

হুঁ, তা বুঝেছি। নিজেকে একটা বানর ধরে নিলে বুঝতে ভারি সুবিধে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে শেখাতে অনেক দিন লেগে যাবে না?

না না, অনেক দিন লাগবে কেন, দু'সপ্তাহে হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে, সেটা খাইয়ে দিলে তো কোনো কথাই নেই। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়।

কোন জায়গায়?

একটা বানর কোথায় পাই?

বানর পাচ্ছেন না?

নাহ্, অনেক খুঁজলাম কয়দিন ধরে, কোথাও বানর নেই। পুরানো ঢাকায় এক জন বলল, এক কাঁদি সাগর কলা আর একটা গরম সোয়েটার হলে সে নাকি ধরে দেবে। আমি তাকে এনে দিলাম, কিন্তু সেই থেকে তার আর দেখা নেই।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, সাগর কলা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বানর ধরার জন্যে সোয়েটার কী জন্যে?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কী জানি! জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা বলল, এখন শীত পড়ে গেছে, তাই বানরেরা নাকি সোয়েটারের জন্যে খুব ব্যস্ত। লোকটা বানর ধরতে গিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়ল কি না কে জানে! বানরেরা খুব দুষ্টু হয় জানেন তো, বিশেষ করে চ্যাংড়া বানরেরা। ঠিকানাও রাখি নি যে একটু খোঁজ নিই।

আমি আর কিছু বললাম না, বিজ্ঞানী মানুষেরা যদি বোকা না হয়, তাহলে বোকা কারা?

বানর কী ভাবে জোগাড় করা যায় সফদর আলী সেটা নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। বানরটা বেশি ছোট হলে অসুবিধে, কাজকর্ম করতে পারবে না।

বনজঙ্গল খুঁজে একটা ধাড়ি বানর ধরে আনতেও সফদর আলীর আপত্তি, তাহলে নাকি পোষ মানাতেই অনেক দিন লেগে যাবে। তার একটি পোষ মানানোর ওষুধ আছে, কিন্তু সেটা একটু কম-বেশি হয়ে গেলে পোষ মানার বদলে নাকি অল্প-অল্প দাড়ি গজিয়ে যায়! সফদর আলীর ইচ্ছা একটা পোষা বানর জোগাড় করা। আমি ভেবেচিন্তে তাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বুদ্ধি দিলাম। একটু ইতস্তত করে সফদর আলী শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। নিজের ঠিকানা জানাতে চান না, তাই একটা পোস্ট অফিস বক্স খুলে নেয়ার কথা বললাম। বিজ্ঞাপনটা আমাকে লিখে দিতে বললেন, লেখালেখি তাঁর নাকি ভালো আসে না। কিন্তু আমি যেটাই লিখি তাঁর পছন্দ হয় না। ভাষাটা নাকি ঠিক জোরালো হচ্ছে না। ঘন্টাখানেক পরিশ্রম করে যেটা তাঁর পছন্দ হল সেটা এরকম :

সন্ধান চাই! সন্ধান চাই!! সন্ধান চাই!!!
পোষা বানরের সন্ধান চাই! উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইব!! যোগাযোগ করুন!!!

সফদর আলী বিজ্ঞাপন লেখা কাগজটি নিয়ে তখন-তখনি খবরের কাগজের অফিসের দিকে রওনা দিলেন, পরবর্তী এক সপ্তাহ সেটি ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপনটি ছাপা হবার সাথে সাথে সফদর আলী বানরের সন্ধান পেতে থাকবেন, আমার ঠিক সেরকম বিশ্বাস ছিল না। সপ্তাহ দুয়েক পার হবার পর হয়তো একটা-দুইটা চিঠি পাবেন, আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম, তাই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আবার যখন টেলিগ্রাম এসে হাজির, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেলিগ্রামটা পড়ে অবশ্যি অবাক থেকে বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠি, কারণ তাতে মাত্র দু'টি শব্দ লেখা :

বিজ্ঞাপন ব্যুমেরাং।

টেলিগ্রামের অর্থ না বোঝার কোনো কারণ নেই, সফদর আলী বলতে চাইছেন, বিজ্ঞাপনটি দেয়ার ফলে কোনো লাভ না হয়ে বরং উল্টো ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। সেটি ঠিক কী ভাবে হতে পারে আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না। সে রাতে আমার আবার এক জায়গায় খাবার দাওয়াত, বড়লোক আত্মীয়, তাদের টাকা পয়সার গল্পে ঠিক জুত করতে পারি না। তাই টেলিগ্রামের অজুহাত দেখিয়ে বাসার সবাইকে আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম। আমার কপাল ভালো। সফদর আলী সেখানে বসে আছেন, তাঁকে দেখে চেনা যায় না। চোখের কোনে কালি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মনে হয় বয়স দশ বৎসর বেড়ে গিয়েছে! আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, কী হয়েছে?

কী হয়েছে? আপনার বুদ্ধি শুনেই তো এখন আমার এই অবস্থা।

কী হয়েছে আগে বলবেন তো!

সফদর আলী কোনো কথা না বলে তাঁর বিরাট পকেট থেকে এক বাণ্ডিল চিঠি বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখেন।

আমি মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বললাম, বাহ্, অনেক চিঠি পেয়েছেন তো!

সফদর আলী মেঘস্বরে বললেন, আগে পড়ে দেখেন।

আমি একটা পোস্ট কার্ড তুলে নিই। সেখানে গোটা গোটা হাতে একটা কবিতা লেখা :

সফদর আলী মিয়া
সদরঘাটে গিয়া
বান্দরের গেঞ্জি কেনে চাইর টাকা দিয়া!

আমি কোনোমতে হাসি চেপে রেখে পরের চিঠিটা খুলি। সেটি শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব,
আপনি বানরের সন্ধান চান? আমার মধ্যম পুত্র (বয়স এগার) এত পাজি যে তার স্বভাব আর বানরের স্বভাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আপনার আপত্তি না থাকিলে তাহাকে আপনার কাছে নিয়া আসিতে চাই ....

এর পরে মধ্যম পুত্রের বিভিন্ন কাজকর্মের নমুনা দেয়া আছে, পড়ে আমারো কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তার স্বভাবের সাথে বানরের স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমি আরেকটা চিঠি তুলে নিই, এটা ঝকঝকে কাগজে লেখা, উপরে একটা ফার্মের নাম আর টেলিফোন নাম্বার। টাইপ করা চিঠি। শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব সফদর আলী,
বানরের জন্য আপনি যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমরা পাইকারি বানর বিক্রেতা, দেশ ও বিদেশে আমরা বানরের চালান দিয়া থাকি। ব্যাবসার কারণে আমরা খুচরা বিক্রয় করিতে অসমর্থ। আপনি যদি দুই শতের অধিক বানর ক্রয় করিতে চান অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আমাদের বানর সুস্থ সবল এবং মিষ্ট স্বভাববিশিষ্ট।......

এরপরে বানরের আকার–আকৃতি এবং স্বভাবের সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা তাঁর চোখে পড়ে গেল। তিনি কেন জানি হঠাৎ আমার উপর রেগে উঠলেন, মুখ কালো করে বললেন, আপনার চিঠি পড়ে হাসি পাচ্ছে? ঠিক আছে, এইটা পড়ে দেখেন হাসি পায় কি না।

সফদর আলী চিঠির বান্ডিল থেকে একটা খাম বের করে দিলেন, ভেতরের চিঠিটা শুরু হয়েছে এভাবে :

শালা,
তোমাদের আমি চিনি। তোমরা আমাদের দেশের বানর বিদেশে পাঠাও তার উপর অত্যাচার করার জন্যে। ভেবেছ আমি তোমাকে খুঁজে পাব না? ঠিকই আমি

তোমাকে খুঁজে বের করব, তারপর কিলিয়ে তোমাকে আমি সিধে করব। তোমাদের মতো মানুষের চামড়া জ্যান্ত ছিলিয়ে সেই চামড়া দিয়ে জুতো বানানো দরকার।

আকরম খান

এই চিঠিটা পড়ে আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে যাই, ভরসার কথা, যারা সামনাসামনি কথা না বলে এরকম উড়ো চিঠি পাঠায়, ব্যক্তিগত জীবনে তারা আসলে কাপুরুষ হয়। বানরের ওপর অত্যাচারের যে কথাটা লিখেছে সেটা অবশ্যি পুরোপুরি অমূলক নয়, পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধের সময় শত্রুদেশের উপর ব্যবহার করার জন্যে যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি করা হয় সেগুলো বিভিন্ন পশুপাখি, বিশেষ করে বানরের উপর নাকি পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের নিরীহ সফদর আলীকে সেজন্যে দায়ী করার কী মানে থাকতে পারে?

আমি সফদর আলীকে সাহস দেয়ার জন্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করি। সফদর আলী সেটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বললেন, মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো হয় কখনো? মানুষের চামড়ার কোনো ইলাস্টিসিটি আছে? আছে?

আমি তাড়াতাড়ি কিছু না বুঝেই বললাম, নেই, একেবারেই নেই। কোথেকে থাকবে?

তাহলে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল আকরম খাঁ মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর কথা বলে খুবই অবিবেচকের মতো কথা বলেছেন। সফদর আলী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বললেন, আমি এর মাঝে নেই, আপনি যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না, এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার। আজ থেকে আমি পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো আনব, খুলে পড়ে দেখব, যদি কোনো কাজের খবর থাকে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

সফদর আলী একটু শান্ত হলেন বলে মনে হল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একটা জিনিস যদি না টেকে সেটা বানিয়ে লাভ আছে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের কথা বলছেন?

জুতোর কথা। মানুষের চামড়া কত পাতলা, সেই জুতো কি এক সপ্তাহের বেশি টিকবে? ভিনিগারে এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রেখে, আল্ট্রাভায়োলেট রে দিয়ে ঘন্টাখানেক যদি শুকানো যায়—

আমি চা খেতে গিয়ে বিষম খেলাম, এই নাহলে আর বিজ্ঞানী!

সফদর আলীর বানরের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপনের উত্তরে যেসব চিঠি এল সেগুলো পড়ে আমি মানুষের চরিত্রের একটা নতুন দিক আবিষ্কার করলাম, মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে শুধুমাত্র ঠাট্টা করার জন্যে চিঠি লিখতে ভারি পছন্দ করে। অসংখ্য চিঠিতে সফদর আলী এবং বানরকে নিয়ে কবিতা, কয়েকটি বেশ ভালো, ছন্দজ্ঞান প্রশংসা করার মতো। ঠিকানা দেয়া থাকলে আমি দেখা করে কবিতা লেখা চালিয়ে যাওয়ার

জন্যে উৎসাহ দিয়ে আসতাম। অনেকে চিঠিতে কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছেন, বানরকে দিয়ে কী করা হবে; অনেকে লিখেছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তারা বানর ধরে দেবে, কয়েকজন আবার আকরম খাঁর মতো ক্ষেপে বানরের ব্যবসা থেকে সরে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। আমি যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির। চিঠিতে শান্তিনগর থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, তাঁর একটি বানর আছে, বানরটিকে যত্ন করে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি বানরটি দিয়ে দিতে পারেন। চিঠি পড়ে আমার খুশি দেখে কে! সফদর আলীর সেই চেহারা অনেক দিন থেকে ভুলতে পারছি না। সবচেয়ে বড় কথা, চিঠিটা ঢাকা থেকে লেখা, ইচ্ছা করলে আমি এখনই গিয়ে খোঁজ নিতে পারি। আমি আর দেরি করলাম না, বাসায় কেউ একজন এসে সন্ধ্যাটা মাটি করার আগেই আমি বের হয়ে পড়লাম।

শান্তিনগরে ভদ্রলোকের বাসা খুঁজে বের করে শুনি তিনি নেই, ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসবেন। আমি সময় কাটানোর জন্যে খানিকক্ষণ এদিক–সেদিক ঘুরে বেড়ালাম। একটা চায়ের দোকানে এককাপ বিস্বাদ চা খেয়ে, একটা পানের দোকানে খানকয়েক আধুনিক গান শুনে, রাস্তার মোড়ে ঘাড় ব্যথা এবং মালিশের ওষুধের উপর একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ঘন্টাখানেক পরে আবার ভদ্রলোকের বাসায় এসে হাজির হই। এবারে ভদ্রলোক বাসায় আছেন, খবর পাঠাতেই বের হয়ে এলেন, মোটাসোটা হাসিখুশি চেহারা। আমি বললাম, আপনার সাথে একটু কাজ ছিল।

আমার সাথে? কাজ? ভদ্রলোক অবাক হবার ভান করে বললেন, আমি এত অকাজের মানুষ, আমার সাথে আবার কারো কাজ থাকতে পারে নাকি! তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দে বাইরে।

আমি পকেট থেকে সফদর আলীকে লেখা তাঁর চিঠিটা বের করে বললাম, আপনি এই চিঠিতে লিখেছিলেন—

ও! আপনিই সফদর আলী! ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি আরো অনেক মোটা হবেন, ভুঁড়ি থাকবে, মাথায় টাক থাকবে আর গায়ের রংটা একটু ফর্সা হবে! বুঝলেন কি না, মানুষের নাম শুনলেই আমার চোখের সামনে তার চেহারাটা ভেসে ওঠে।

আমি বললাম, আমি সফদর আলী না, সফদর আলী আরেকজন, আমি তাঁর হয়ে এসেছি।

ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আসল সফদর আলীর ভুঁড়ি আছে? মাথায় টাক?

ভদ্রলোককে নিরাশ করতে আমার একটু খারাপই লাগে, কিন্তু কী করব, বলতেই হয় সফদর আলীর ভুঁড়ি নেই, টাক নেই—বেমানান গোঁফ আছে, কিন্তু সেটা তো আর নাম শুনে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নি।

মানুষের নাম এবং চেহারার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। সুযোগ পেয়ে একসময় আমি বানরের কথাটা তুলে আনি। আমি খোলাখুলিভাবে বললাম বানরটার কেন প্রয়োজন, সফদর আলী তাকে কাজকর্ম শিখিয়ে সহকারী বানাবেন। আমি ভদ্রলোককে সফদর আলী সম্পর্কে বললাম, তিনি একজন শখের বিজ্ঞানী এবং লোকজনের ধারণা, তাঁর মাথায় ছিট আছে, আমার নিজেরও সে সম্পর্কে কোনো

সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নেহায়েতই এক জন ভালোমানুষ। বানরটিকে তিনি নানারকম জিনিস শেখাবেন, কিন্তু কখনোই তিনি কোনোরকম কষ্ট দেবেন না। আমার ধারণা তিনি কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটি ভালো বোঝেন না।

ভদ্রলোক এককথায় বানরটি দিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন, আমি একটু কায়দা করে টাকার প্রসঙ্গটা তুলতেই ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন, বললেন, জংবাহাদুর আমার ছেলের মতো, আমি তাকে বিক্রি করতে পারি?

জংবাহাদুর?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর আমার বানরটার নাম। কেউ তাকে যত্ন করে রাখলে এমনিই দিয়ে দেব, কিন্তু বিক্রি আমি করতে পারব না। মাঝেমধ্যে গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু টাকা আমি কী ভাবে নিই?

এবারে আমি উল্টো লজ্জা পেয়ে যাই। একটু থতমত খেয়ে বললাম, আপনার এত শখের বানর দিয়ে দিচ্ছেন কেন, রেখে দিন।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে তাহলে বলি, আগে কাউকে বলি নি। আমার একটা ছেলে আছে, এক বছর বয়স, জংবাহাদুরকে তার ভারি পছন্দ! আমি বাবা, আমার কাছে আসতে চায় না, দিনরাত্রি জংবাহাদুরের পিছনে ঘুরঘুর করে। যত দিন যাচ্ছে ততই আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাবা হয়ে আমি সেটা কেমন করে সহজভাবে নিই? বুঝতেই পারেন জংবাহাদুর যেরকম খেলা দেখাতে পারে, আমি কি আর সেরকম খেলা দেখাতে পারি? ছেলের কী দোষ? সে আমাকে পছন্দ করবে কেন? এক বছরের ছেলে কি আর এত কিছু বোঝে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল বানরের সাথে খেলা দেখানো নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের সাথে আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল, বেশ মানুষটি। আরো এককাপ সর–ভাসা চা খেয়ে উঠে পড়ার আগে বললাম, বানরটা কবে নিতে আসব?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, এখনই নিয়ে যান।

এখনই? আমি?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর খুবই ভদ্র, বিরক্ত করবে না। বয়স হয়েছে, বানরের হিসেবে রীতিমতো বুড়ো, খুব শান্ত। নিজের চোখেই দেখেন, বলে ভদ্রলোক চিৎকার করে ডাকলেন, জংবাহাদুর, এদিকে এস।

পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা বানরের গম্ভীর মুখ দেখা গেল, আমাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বানরটি আবার পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনাকে নতুন দেখেছে তো তাই কাপড় পাল্টে আসছে।

সত্যি তাই, একটু পরেই একটা লুঙ্গি পরতে–পরতে বানরটা বেরিয়ে এল, হেঁটে হেঁটে আমার সামনে এসে হাত তুলে আমাকে একটা সালাম করে গম্ভীর হয়ে একটা চেয়ারে বসে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার কি সালামের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

ভদ্রলোক বানরটিকে বললেন, জংবাহাদুর, তুমি, এখন এই ভদ্রলোকের সাথে যাবে, বুঝতে পেরেছ? বানরটি কী বুঝল জানি না, কিন্তু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল,

যেন সত্যি বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোক আবার বললেন, যাও, শার্ট পরে এস, আর তোমার দড়িটি নিয়ে এস।

বানরটি সত্যিই ভদ্রলোকের কথা শুনে চেয়ার থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন, হঠাৎ আমার তার জন্যে খুব কষ্ট হল, খুব শখের বানর, নিজেই বলেছেন একেবারে নাকি ছেলের মতো, দিয়ে দিতে নিশ্চয়ই তাঁর খুব খারাপ লাগছে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, দেখেন, আপনার যদি খুব খারাপ লাগে, থাকুক, আমরা অন্য একটা বানর জোগাড় করে নেব।

ভদ্রলোক বললেন, খারাপ তো লাগছেই, এত দিন থেকে আমার সাথে আছে, সে তো প্রায় ঘরের মানুষ, কিন্তু তবু আপনি নিয়েই যান। ছেলেটার শুধু যে জংবাহাদুরের সাথে খাতির তাই নয়, আজকাল তাকে দেখে দেখে বানরের মতো ব্যবহার করা শুরু করেছে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ছোট বাচ্চা যা–ই দেখে তা–ই শেখে, ওর আর দোষ কি? আর আপনি জংবাহাদুরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, সফদর আলী তাকে অনেক যত্ন করে রাখবেন। আপনার যখন দেখার ইচ্ছা হবে গিয়ে দেখতে পারেন, ইচ্ছা হলে যখন খুশি বাসায় এনে যত দিন খুশি রাখতে পারেন।

ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুব খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভালো হয় তাহলে। মাঝে মাঝে বাসায় এনে কয়দিন রেখে ভালো করে খাইয়ে দেব, খুব খেতে পছন্দ করে বেচারা।

একটু পরেই জংবাহাদুর একটা শার্ট পরে হাজির হয়, তার মাথায় একটা হ্যাট, হাতে একটা টিনের বাক্স, ভেতরে নিশ্চয়ই তার স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি। তার গলায় দড়ি বাঁধা, দড়ির এক মাথা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে লম্বা একটা সালাম করল। ভদ্রলোক জংবাহাদুরকে তুলে খানিকক্ষণ বুকে চেপে ধরে রেখে নামিয়ে দিলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেছে। আমি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেখানে আমার বাসার ঠিকানা, অফিসের টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলাম। ভদ্রলোককে বললাম, আমাকে ফোন করলেই আমি তাঁর সাথে জংবাহাদুরের দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।

জংবাহাদুরকে নিয়ে বের হতেই এই এলাকার লোকজন তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, বোঝাই যাচ্ছে সে এই এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। জংবাহাদুরও কাউকে সালাম কাউকে হ্যাট খুলে সম্ভাষণ আবার কাউকে দাঁত বের করে ভেংচি কেটে প্রত্যুত্তর দেয়। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। তাই প্রথম রিকশাটা পেয়ে দরদাম না করেই জংবাহাদুরকে নিয়ে উঠে পড়লাম। আমি আগে কখনো পশুপাখি নাড়াচাড়া করি নি, তাই একটু ভয় ভয় করছিল, বানরটা যদি হঠাৎ করে খামচে দেয়?

জংবাহাদুরকে নিয়ে রিকশা করে যাওয়াটা খুব উপভোগ্য ব্যাপার নয়। প্রথমে রিকশাওয়ালা জানতে চাইল আমি কত দিন থেকে বানরের খেলা দেখাই এবং এতে আমার কেমন উপার্জন হয়। আমি তাকে খুশি করার মতো উত্তর দিতে পারলাম না। রাস্তায় লোকজন, বিশেষ করে বাচ্চারা আমাকে "বানরওয়ালা" বলে ডাকতে থাকে।

রাজারবাগের মোড়ে রিকশার দিকে একটা পাকা কলা ছুটে এল। সময়মতো মাথা নিচু করায় কলাটা আমার মাথায় না লেগে রিকশার পিছন দিকে গিয়ে লাগল। আমি আমার জানা সমস্ত দোয়া-দরুদ পড়তে থাকি। আজ অক্ষত শরীরে শ্যামলীতে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছুতে পারলে কাল দুই টাকা দান করে দেব বলে মানত করে ফেললাম।

ফার্মগেটের কাছে, যেখানে লোকজনের ভিড় সবচেয়ে বেশি এবং যেখানে লোকজন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে আমাকে এবং জংবাহাদুরকে ডাকাডাকি করতে থাকে, সেখানে আমাদের রিকশার টায়ার ফেটে গেল। চার বছর আগে আরামবাগে এক জন ছোরা দেখিয়ে আমার মানিব্যাগে টাকা এত কম কেন সেটা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার সময়েও আমি এত ভয় পাই নি। রিকশা থেমে যেতেই আমাদের ঘিরে একটা ছোট ভিড় জমে যায়। তার ভিতর থেকে এক জন দুর্ধর্ষ ধরনের বাচ্চা জংবাহাদুরের লুঙ্গির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লেজ ধরে টানার চেষ্টা করতে থাকে। আমি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে আরেকটা খালি রিকশা খুঁজতে থাকি, কিন্তু আমার সমস্ত পাপকর্মের প্রতিফল হিসেবে একটিও খালি রিকশা বা স্কুটার দেখা গেল না। আমি আরেকটা রিকশা না পাওয়া পর্যন্ত এই রিকশা থেকে নামতে চাইছিলাম না, কিন্তু এক জন পুলিশ এসে বলল, রাস্তায় বানরের খেলা দেখানো বেআইনি এবং আমি যদি একান্তই খেলা দেখাতে চাই তাহলে আমাকে রাস্তার পাশে খালি জায়গাটায় যেতে হবে। তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর আগেই সে আমাকে এবং আমাদের ঘিরে থাকা লোকজনকে ঠেলে-ঠেলে ফাঁকা জায়গাটিতে নিয়ে যায়। আমি কিছু বোঝার আগেই লোকজন আমাদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পুলিশটি সামনের লোকজনদের বসিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তখন টপটপ করে ঘামছি, কোনোমতে ভাঙা গলায় বললাম, দেখেন, আমি বানরের খেলা দেখাই না, এটা আরেক জনের বানর—

লোকজনের উল্লাসধ্বনিতে আমার কথা চাপা পড়ে যায়, আমার কথায় এত আনন্দের কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না, তখন আমার জংবাহাদুরের দিকে চোখ পড়ে। সে তার টিনের বাক্স খুলে জিনিসপত্র বের করা শুরু করেছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ম্যাচ দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে দু'টি লম্বা টান দিয়ে সে খেলা শুরু করে দেয়। প্রথমে একটা ডুগডুগি বের করে বাজাতে থাকে, তারপর এক কোনা থেকে ছুটে এসে শূন্যে দু'টি ডিগবাজি খেয়ে নেয়। লোকজন যখন হাততালি দিতে ব্যস্ত, তখন সে যে ছেলেটি তার লেজ ধরে টানার চেষ্টা করেছিল তাকে খুঁজে বের করে তার কান ধরে মাঝখানে টেনে এনে গালে প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দেয়। লোকজনের উল্লাসধ্বনির মাঝে ছেলেটা প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মুখ চুন করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে। এরপর জংবাহাদুরের আসল খেলা শুরু হয়, তার খেলা সত্যি দেখার মতো। বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত, মানুষের অনুকরণ, বিকট মুখভঙ্গি, উৎকট নাচ, কী নেই! শুধু তাই নয়, খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে ক্রমাগত তার ডুগডুগি বাজিয়ে ভিড় আরো বাড়িয়েই যায়। আমি বোকার মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি আর প্রাণপণ দোয়া করতে থাকি পরিচিত কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে। খোদা আমার দোয়া শুনবে, আমার নিজের উপর সেরকম বিশ্বাস ছিল না, তাই যখন ভিড়ের মধ্যে আমাদের অফিসের বড় সাহেবকে আবিষ্কার করলাম,

তখন বেশি অবাক হলাম না। খেলা শেষ হতেই জংবাহাদুর তার টুপি খুলে পয়সা আদায় করা শুরু করে, আমি নিষেধ করার সুযোগ পেলাম না। লোকজন পয়সাকড়ি বেশ ভালোই দিল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি বড় সাহেব একটা আস্ত আধুলি দিয়ে দিলেন। জংবাহাদুর খুচরা পয়সাগুলো রুমালে বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। পরে গুনে দেখেছিলাম, মানতের দুই টাকা দেওয়ার পরেও দু'টি অচল সিকিসহ প্রায় সাড়ে তিন টাকা রয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সফদর আলীর বাসায় জংবাহাদুরকে পৌঁছে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর যা-ই করি, কখনো বানর নিয়ে রাস্তায় বের হব না। বানরের খেলা দেখানো নিয়ে উত্তেজনা কমতে-কমতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গেল। ফার্মগেটের মোড়ে সেদিন আমাকে কত মানুষ দেখছিল তার হিসেব নেই। সবাই বাসায় এসে সেটা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে গেছে। আমি ব্যাপারটি যতই বোঝানোর চেষ্টা করি, কেউ আর বুঝতে চায় না। আমার মা এখনো একটু পরে পরে বলেন, ছি ছি ছি, তোর নানা এত খান্দান বংশের লোক, আর তাঁর নাতি আজ রাস্তায় বানরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়! অফিসের বড় সাহেবকে নিয়েও মুশকিল, একটু পরে-পরে সবার সামনে আমাকে প্রশংসা করে বলেন, আমার মতো স্বাধীনচেতা মানুষ তিনি নাকি জীবনে দেখেন নি। অফিসের বেতন যথেষ্ট নয় বলে বিকেলে আমার বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জনের সৎসাহস দেখে তিনি নাকি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে অনেক কষ্ট করেও ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝানো গেল না। বড় সাহেবদের মাথা একটু নিরেট হয়, কোনো কিছু একটা ঢুকে গেলে সেটা আর বের হতে চায় না।

সপ্তাহখানেক পর আমার সফদর আলীর সাথে দেখা, সফদর আলী হচ্ছেন এমন এক জন মানুষ যার মুখ দেখেই মনের কথা পরিষ্কার বলে দেয়া যায়। আজ যেরকম তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম, তাঁর কাজকর্ম ভালোই হচ্ছে, তিনি তাঁর বানরকে নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর চোখের কোনা একটু কুঁচকে আছে, যার অর্থ কোনো একটা কিছু নিয়ে তিনি একটু চিন্তিত। আমাকে দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, হাসিমুখে বললেন, বানর স্ক্রু-ড্রাইভার ধরে কেমন করে জানেন?

আমি জানতাম না, তাই তিনি পকেট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে দেখালেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে এত হাস্যকর যে তিনি কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারেন না। আমি চুপ করে বসে রইলাম, কারণ আমিও ঠিক ওভাবে স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করি। তাঁর হাসি একটু কমে এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বানরের ট্রেনিং কেমন হচ্ছে?

ভালো, বেশ ভালো। প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল।

কি অসুবিধে?

মনোযোগের অভাব, কিছুতেই জংবাহাদুরের মনোযোগ নেই, শুধু গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনার না একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা খেতে এত খারাপ যে কিছুতেই জংবাহাদুরকে খাওয়াতে রাজি করাতে পারলাম না।

এখন মনোযোগ দিচ্ছে?

হ্যাঁ, এক সপ্তাহ পরে গত কাল প্রথম সে মনোযোগ দিয়েছে। হঠাৎ করে মনোযোগ দিল।

হঠাৎ করে?

হ্যাঁ, হঠাৎ করে। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

বানরের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তাই এক সপ্তাহ অন্যমনস্ক থেকে হঠাৎ করে মনোযোগ দেয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। হয়তো নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে সময় নিয়েছে, হয়তো ভেবেছিল একটা সাময়িক ব্যাপার, আবার সে তার আগের বাসায় ফিরে যাবে। হয়তো তার মন খারাপ, বানরের মন খারাপ হতে পারে না এমন তো কেউ বলে নি—

গুলু গুলু গুলু গুলু—আমি হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলছেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

থতমত খেয়ে বললাম, কী বললেন?

সফদর আলী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি বললাম?

আমি ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, মানে আপনি কেমন একটা শব্দ করছিলেন না?

আমি? সফদর আলী আকাশ থেকে পড়লেন, আমি শব্দ করছিলাম?

হ্যাঁ।

কী রকম শব্দ?

আমি এদিকসেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে তাঁকে অনুকরণ করে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

শুনে সফদর আলীর হাসি দেখে কে। পেট চেপে হাসতে হাসতে তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। কোনোমতে বললেন, আমি ওরকম শব্দ করেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে রেস্টুরেন্টে লোকজনের মাঝে বসে বসে ওরকম শব্দ করব?

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। সত্যিই তো, এক জন বয়স্ক মানুষ হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কেন ওরকম একটা জিনিস বলবে? তা হলে কি আমি ভুল শুনেছি? কিন্তু সেটাও তো হতে পারে না, আমি স্পষ্ট শুনলাম তিনি বললেন—গুলু গুলু গুলু গুলু। আমি ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না, সবাই জানে বিজ্ঞানীরা একটু খেয়ালি হয়, আর সফদর আলী তো এক ডিগ্রি উপরে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা, রিকশা করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি রেসকোর্সের পাশ দিয়ে সফদর আলী হেঁটে যাচ্ছেন, আমি রিকশা থামিয়ে ডাকলাম, সফদর সাহেব।

সফদর আলী ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

বাসায়।

এখনি বাসায় গিয়ে কী করবেন? আসেন হাঁটি একটু। হাঁটলে পা থেকে রক্ত

সঞ্চালন হয়, খুব ভালো কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম।

কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়ামের লোভে নয়, সফদর আলীর সাথে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার জন্যেই আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। দু'জন রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, বছরের এই সময়টা এত চমৎকার যে বলার নয়। আমি সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, জংবাহাদুরের কী খবর? কাজকর্মে মনোযোগ দিয়েছে?

হ্যাঁ, দিচ্ছে, একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে এখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত সপ্তাহে তাকে সল্ডারিং করা শিখিয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, চমৎকার সল্ডারিং করে।

বাহ্!

এখন সার্কিট বোর্ড তৈরি করা শেখাচ্ছি। আল্ট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে এক্সপোজ করে ফেরিক ক্লোরাইড নিয়ে "এচ" করতে হয়, ঠিকমতো না করলে বেশি না হয়ে কম হয়ে যায়, নানা ঝামেলা তখন।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও, আচ্ছা।

ফেরিক ক্লোরাইড জিনিসটা ভালো না, আরেকটা কিছু বের করা যায় কি না দেখতে হবে।

আমি এসব রাসায়নিক ব্যাপার কিছুই বুঝি না। আমার এক ভাগ্নে একদিন কথা নেই বার্তা নেই আমার ধোয়া শার্টে লাল রং ঢেলে দিল, আমি তো রেগে আগুন, কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে লাল রং উবে আবার ধবধবে সাদা শার্ট, লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই! আমি তো ভারি অবাক, আমার ভাগ্নে তখন বুঝিয়ে দিল, এটা নাকি কী একটা রাসায়নিক জিনিস, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রংটা উবে যায়। আমি তখন আমার ভাগ্নেকে বললাম, আমাকে এক বোতল বানিয়ে দিতে, অফিসে বড় সাহেবের গায়ে ঢেলে মজা দেখাব। আমার সেই ভাগ্নে প্রচণ্ড পাজি, একটা বোতলে খানিকটা লাল কালি ভরে দিয়ে দিল। আমি তো কিছু জানি না, অফিসে গিয়ে সবার সামনে বড় সাহেবের নতুন শার্টে সেই লাল রং ঢেলে দিলাম, এক মিনিট দুই মিনিট করে দশ মিনিট পার হয়ে গেল, রং উবে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই, বরং আরো পাকা হয়ে বসে গেল। সে কী কেলেঙ্কারি, চিন্তা করে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চমকে উঠি, সফদর আলী আবার ওরকম শব্দ করছেন! আমি ভান করলাম যেন শুনি নি, চুপচাপ হাঁটতে থাকি। সফদর আলী আবার বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, একটা ব্যাপারে মানুষের চেয়ে বানরের সুবিধে আছে, সেটা হচ্ছে তার পা। মানুষ তার পা দিয়ে কিছু ধরতে পারে না, বানর পারে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আপনি একটু আগে ওরকম শব্দ করছিলেন

কেন?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, কী রকম শব্দ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু এবারে কোনো ভুল নয়, আমি স্পষ্ট শুনেছি। আমি কী মনে করে সফদর আলীকে বেশি ঘাঁটালাম না, চিন্তিতভাবে হাঁটতে থাকি। আর্ট কলেজের সামনে এসে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, হঠাৎ শুনি সফদর আলী আবার অদ্ভুত গলার স্বরে বলছেন, মুচি মুচি মুচি মুচি—

আমি ভীষণ চমকে উঠলেও ভান করলাম যেন তাঁর কথা শুনতে পাই নি, সফদর আলী বলতেই থাকেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, লেজ জিনিসটা আসলে খারাপ নয়। ওটা একটা বাড়তি হাতের মতো। মানুষের লেজ থাকলে মন্দ হত না!

আমি বললাম, আপনি জানেন, একটু আগে আপনি বলছিলেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

কী বলছিলাম?

মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ, আমি শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?

আপনার অফিসের কাজকর্মের চাপ নিশ্চয়ই খুব বেড়েছে, সফদর আলী হাসি গোপন করার চেষ্টা করে বললেন, আপনার কয়দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার। খুব চাপে থাকলে মানুষের বিভ্রম হয়, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা গুলিয়ে ফেলে। আপনি বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকেন।

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেলাম, এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। আমি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে সফদর আলী নিজের অজান্তে এরকম অদ্ভুত শব্দ করেন। কিন্তু কেন? প্রত্যেক বার তিনি শব্দ করেছেন, যখন আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি তখন। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে আমি খানিকক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। আর সত্যি সত্যি তিনি অদ্ভুত শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। খানিকক্ষণ পরে বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি। আমি তবু অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করি। তখন হঠাৎ সফদর আলী ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে শুরু করলেন। ঠিক এই সময়ে এক জন সামনে দিয়ে আসছিল, রাস্তায় বয়স্ক এক জন মানুষ এভাবে লাফ দিচ্ছে দেখলে সে কী ভাববে? আমি তাড়াতাড়ি সফদর আলীর দিকে তাকাই। সাথে সাথে তিনি ভালোমানুষের মতো বললেন, বিবর্তনটা যদি একটু অন্যরকমভাবে হত, তাহলে হয়তো আজ মানুষের জায়গায় বানর পৃথিবীতে রাজত্ব করত, আর মানুষ গাছে গাছে

ঘুরে বেড়াত। কী বলেন?

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে কিছু একটা বললাম, কিন্তু আমার মাথায় সফদর আলীর এই আশ্চর্য আচরণের কথা ঘুরতে থাকে। এর ব্যাখ্যা পাই কোথায়? অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে থাকলে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেন দেখার জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করি। যখন দেখলাম রাস্তায় আশেপাশে কেউ নেই, তখন আবার আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই সফদর আলী আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। তাতে কাজ না হওয়ায় বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি, খানিকক্ষণ পর ছোট ছোট লাফ দিতে শুরু করলেন। সাথে হাততালি। আমি তবুও জোর করে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করতে থাকি। তখন হঠাৎ তিনি যেটা করলেন, আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে খানিক দূর হামাগুড়ি দিয়ে গেলেন, তারপর উঠে মুখে থাবা দিয়ে বললেন, লাবা লাবা লাবা লাবা।

আমি বিস্ফোরিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তিনি স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কী হল আপনার?

কেন?

এরকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

আমি উত্তরে আর কী বলব? ঠিক করলাম, ব্যাপারটা আজকে তাঁর কাছে চেপে যাব। একটু ভেবে দেখতে হবে রহস্যটা কি। সফদর আলীকে একটা দায়সারা উত্তর দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় রওনা দিলাম। ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করি। সফদর আলীর এই অদ্ভুত ব্যবহারের সাথে নিশ্চয়ই বানরটার কোনো সম্পর্ক আছে। বানরটাকে কাজকর্ম শেখানো শুরু করার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। অন্যমনস্ক হলেই মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনি এটা করেন, প্রথম প্রথম বানরটিও নাকি অন্যমনস্ক থাকত। দুটির মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? নাকি বানরের সাথে থাকতে থাকতে তাঁর স্বভাবও বানরের মতো হয়ে যাচ্ছে? আর অন্য সব ব্যাপারে তিনি আগের মতোই আছেন। কাজেই বেশি পরিশ্রমে পাগলামি দেখা দিচ্ছে, সেটাও তো হতে পারে না। আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। আগে নাকি কাপালিকরা বানরকে দিয়ে কী একধরনের সাধনা করত। কে জানে এটি সেরকম কোনো বানর কি না। এর মাঝে জাদুটোনার ব্যাপার আছে কি না কে বলবে। ভেবে-ভেবে আমি কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। ভাবনা-চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, খানিকক্ষণের মধ্যেই তাই মাথা ধরে গেল, বাসায় এসে দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে তবে রক্ষা।

পরদিন অফিস থেকে বাসায় এসে দেখি আবার টেলিগ্রাম, না-খুলেই বুঝতে পারি এটা সফদর আলীর। সত্যি তাই, ভেতরে লেখা :

মহা আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি ঠিক। আমি বলি, গুলু গুলু গুলু গুলু এবং মুচি মুচি মুচি মুচি। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

তবু ভালো শেষ পর্যন্ত সফদর আলী নিজেই ধরতে পেরেছেন যে, তিনি আশ্চর্য-আশ্চর্য সব শব্দ করছেন। এক জন মানুষ যখন না জেনে কিছু করে, তার জন্যে তাকে দায়ী করা খুব মুশকিল। কে জানে তিনি বুঝতে পেরেছেন কি না, কেন এরকম করছেন, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না।

ঠিক পাঁচটার সময় আমার ছোট ভাইঝি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলল। এটি নতুন কোনো ব্যাপার নয়। প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে অন্তত এক বার করে তার এধরনের কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে নিয়ে দৌড়ালাম ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার তার মাথাটা খানিকটা কামিয়ে সেখানে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তাকে নিয়ে ফিরে আসার আগে জিজ্ঞেস করলাম, তার কেমন লাগছে। সে বলল, তার বেশি ভালো লাগছে না, তবে যদি খানিকটা আইসক্রিম খায় তবে মনে হয় ভালো লাগতে পারে। এরকম একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেবার পর তাকে আইসক্রিম না খাইয়ে বাসায় আনি কেমন করে? আইসক্রিমের দোকান খুঁজে আইসক্রিম কিনে দিয়ে যখন বাসায় ফিরে এলাম, তখন ছয়টা বেজে গেছে। কাওরান বাজারে যেতে যেতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যাবে। সফদর আলীর সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস, কাজেই আজ যে তাঁর সাথে দেখা হবে না তা বলাই বাহুল্য। আমি তবু তাড়াহুড়ো করে বের হলাম। চায়ের দোকানে গিয়ে সত্যিই তাঁকে পেলাম না। দোকানি বলল, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি নাকি বেরিয়ে গেছেন। তাঁর বাসায় গিয়ে এখন আর লাভ নেই। এরকম সময়ে তিনি কখনো বাসায় থাকেন না। আমি এককাপ চা অর্ডার দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে বসি। কী হতে পারে ব্যাপারটা? কেন সফদর আলী হঠাৎ করে নিজের অজান্তে এরকম আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করেছেন? নিশ্চয়ই বানরটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে। হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগে বানরের ইতিহাসটা জানতে হবে। আমার তখন শান্তিনগরের সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল, যাঁর কাছ থেকে বানরটা এনেছিলাম, তিনি হয়তো কোনো একটা সমাধান দিতে পারেন। আমি তাড়াতাড়ি করে চা শেষ করে তাঁর বাসায় রওনা দিলাম, কপাল ভালো থাকলে আজকেই তাঁকে পেয়ে যেতে পারি।

বাসাটা আবার খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল, এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। দরজার কড়া নাড়তেই ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, আরে আসেন, আসেন। কী খবর আপনার? কয়দিন থেকেই ভাবছি জংবাহাদুরের খোঁজ নিই, ভালোই হল আপনি এসে গেলেন। তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দিয়ে যা বাইরে।

আমি ঘরে গিয়ে বসি। ভদ্রতার কথাবার্তা বলতে বলতে বানরের ইতিহাসটা জিজ্ঞেস করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকি। সফদর আলীর অবস্থাটা এখন তাঁর কাছে গোপন রাখব বলে ঠিক করলাম, শুনে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবেন। ভদ্রলোক বেশ কথা বলেন, জংবাহাদুরের খোঁজখবর নিয়ে আবার তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু, মানুষের নামের সাথে চেহারার সামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ভেতর থেকে একসময় সর-ভাসা চা এবং সিঙাড়া এল। আমি সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে চা

তুলে এক চুমুক খেয়েছি, হঠাৎ ভদ্রলোকের ঘরের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

চমকে উঠে বিষম খেলাম আমি, গরম চা দিয়ে তালু পুড়ে গেল। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো অবস্থা নেই। কান খাড়া করে রাখি আমি, আর তখন সত্যি আবার শুনলাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শুনলাম, মুচি মুচি মুচি মুচি। তারপর হঠাৎ পর্দা ঠেলে বছরখানেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা থপ থপ করতে করতে ঘরে এসে হাজির হল। আমাকে অপরিচিত দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার মুখ হাসি হাসি করে আধো আধো গলায় বলল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

পুত্রস্নেহে বাবার চোখ কোমল হয়ে ওঠে, তিনি হাত নেড়ে ডাকতেই খুশিতে ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে থাকে, ঠিক সফদর আলী যেভাবে লাফিয়েছিলেন। বাচ্চাটি এখনো ভালো করে হাঁটতে শেখে নি, তাই টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গেল, পড়ে গিয়েও তার খুশি, কে, সেভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তার বাবার দিকে, ঠিক সফদর আলীর মতো।

আমি রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আরো বড় রহস্যে পড়ে গেলাম। সফদর আলী যেসব অদ্ভুত শব্দ করছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির আধো আধো বুলি, যেসব লাফ-ঝাঁপ বা হামাগুড়ি দিচ্ছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির নিখুঁত অনুকরণ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি এই বাচ্চাটির অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত জানেন না। কেমন করে এটা সম্ভব?

ভদ্রলোকের বাসায় আরো কিছুক্ষণ থাকলাম, কিন্তু আলাপ আর জমল না। কেমন করে জমবে, আমার মাথায় তখন সফদর আলীর কথা ঘুরছে। বাসায় ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে আমি পুরো ব্যাপারটি ভাবতে থাকি, ভাবতে ভাবতে মনে হল পুরো মাথাটা ফেটে যাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। বেশি ভাবনা-চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, চেষ্টা করলে সহজেই মাথা ধরে যায়। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে যেই রিকশাওয়ালার সাথে গল্প শুরু করলাম, ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ করে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল—একেবারে পানির মতো।

সফদর আলীকে দরকার, তাঁকে পাওয়া মুশকিল বলে আমিও তাঁর কায়দায় তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম, তাতে লেখা,
রহস্য উদ্‌ঘাটন। গুলু গুলু গুলু গুলু কেন? সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

পরদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় গিয়ে দেখি সফদর আলী পাংশু মুখে বসে আছেন, আমাকে দেখে প্রায় ছুটে এলেন, গলা নামিয়ে বললেন, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

আমার গবেষণা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে, আমার পিছনে দেশী-বিদেশী

এজেন্ট লেগে গেছে।

কী ভাবে জানলেন?

আমি যে আশ্চর্য–আশ্চর্য শব্দ করি সেটা পর্যন্ত জেনে গেছে। আজ একটা টেলিগ্রাম পেলাম, কে পাঠিয়েছে জানি না, লিখেছে রহস্য উদ্‌ঘাটন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বুঝতে পারেন নি, এটা আমি পাঠিয়েছি।

আপনি! সফদর আলী মনে হল আকাশ থেকে পড়লেন, আপনি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন?

হ্যাঁ।

তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না, একটু রেগে বললেন, টেলিগ্রাম করেছেন তো নাম লেখেন নি কেন?

আপনিও তো আপনার টেলিগ্রামে নাম লেখেন না।

আমি যদি নাম না লিখি সেটা আমার ভুল। আমি একটা ভুল করি বলে আপনিও একটা ভুল করবেন?

এর উত্তরে আমি আর কী বলব?

সফদর আলী খানিকক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে বললেন, রহস্যটা বলেন, তাহলে শুনি।

আমি হাসি চেপে বললাম, বানরটাকে আপনি কেমন করে শেখান মনে আছে? পুরস্কার পদ্ধতি। যখনই বানর একটা ঠিক জিনিস করে আপনি তাকে একটা পুরস্কার দেন, একটা কলা বা কোনো একটা খাবার।

হ্যাঁ।

আসলে একই সময়ে বানরটাও আপনার উপরে পুরস্কার পদ্ধতি খাটিয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন ঠিক জিনিসটা করেন বানরও তখন আপনাকে একটা পুরস্কার দেয়। সেটা হচ্ছে তার মনোযোগ। বানরের কাছে কলাটা যত মূল্যবান আপনার কাছে বানরের মনোযোগ ঠিক ততটুকু মূল্যবান। আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন বানরের মনোযোগের জন্যে, অনেক কিছু করতে করতে যখন হঠাৎ করে ঠিক জিনিসটা করে ফেলেন, বানর তখন পুরস্কার হিসেবে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, ঠিক জিনিসটা কি?

সে যেটা শুনতে চায়।

কী শুনতে চায় সে?

বানরটা যে বাসা থেকে এনেছি, সে বাসায় একটা ছোট বছরখানেকের বাচ্চা আছে, বানরটার সাথে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। বানরটার বাচ্চাটার জন্যে খুব মায়া জন্মেছিল, আপনার বাসায় আসার পর থেকে সে তাকে আর দেখে না। বানরটা নিশ্চয়ই বাচ্চাটাকে খুব দেখতে চাইছিল, তার গলার স্বর শুনতে চাইছিল। কাজেই আপনি যখনি সেই ছোট বাচ্চাটির মতো শব্দ করেন বা তার মতো লাফ দিয়ে হাততালি দেন, হামাগুড়ি দেন—সে খুশি হয়ে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, আপনি কী ভাবে জানেন?

আমি কাল জংবাহাদুরের মালিকের বাসায় গিয়েছিলাম, বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি,

বাচ্চাটি কিছু হলেই বলে, গুলু গুলু গুলু গুলু বা মুচি মুচি মুচি মুচি। জংবাহাদুরের মনোযোগের জন্যে এখন আপনিও নিজের অজান্তেই বলেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আসলে তা-ই হয়েছে। বানরটাকে মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ খাওয়াতে না পেরে নিজেই একটু চেখে দেখছিলাম, নিজের মনোযোগ তাই বেড়ে গিয়েছিল দশগুণ। তাই থেকে সফদর আলী আপন মনে কী একটা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

আমি বললাম, এখন যখন কারণটা জেনেছেন, একটু সতর্ক থাকবেন।

সফদর আলী আমার কথা শুনলেন বলে মনে হল না। আমি ডাকলাম একবার, কোনো সাড়া নেই। ঠাট্টা করার জন্যে গলা উঁচিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী ঠাট্টা-তামাশা বোঝেন কম, আমার কথা শুনে ভীষণ চমকে উঠে চায়ের কাপ উল্টে ফেললেন, আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠতে থাকে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি। ঠাট্টা-তামাশা বাড়ানোর একটা ওষুধ বের করতে পারলে মন্দ হত না, ডাবল ডোজ খাইয়ে দেয়া যেত সফদর আলীকে।

গাছগাড়ি

সফদর আলীর চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করছিল, আমাকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন, বলেন দেখি আজ কোথায় গিয়েছিলাম?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সিনেমা দেখতে?

ধুর! সিনেমা আবার মানুষ দেখে নাকি?

আমি এইমাত্র ম্যাটিনি শো'তে একটা প্রচণ্ড মারামারির সিনেমা দেখে এসেছি, তাই মন্তব্যটা কোনোমতে হজম করে বললাম, তাহলে কি নাটক?

আরে না না, ওসব নাটকফাটক আমি দেখি না!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে কি কোনো কনফারেন্স, যেখানে সব বিজ্ঞানীরা এসে—

সফদর আলী হো-হো করে হেসে উঠলেন, তিনি জোরে হাসেন কম, তাই আমি একটু অবাক হয়ে যাই। হাসি থামিয়ে বললেন, বিজ্ঞানীরা আমাকে তাদের কনফারেন্সে ঢুকতে দেবে কেন? আমি কোথাকার কে?

আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, সফদর আলী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পারলেন না তো বলতে! রমনা পার্কে গিয়েছিলাম।

রমনা পার্ক?

হ্যাঁ, ঐ যে শিশুপার্কের পাশ দিয়ে গিয়ে—

হ্যাঁ, চিনি আমি।

চেনেন? সফদর আলী খুব অবাক হলেন বলে মনে হল।

চিনব না কেন? রমনা পার্ক না চেনার কী আছে, যখন কলেজে পড়তাম, নতুন সিগারেট খাওয়া শিখে—

আপনি রমনা পার্ক চেনেন অথচ আমাকে একবার বললেন না?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী বললাম না?

রমনা পার্কের কথা।

আমার খানিকক্ষণ সময় লাগে তাঁর কথাটা বুঝতে। অবাক হয়ে বললাম, আপনি এত বছর ধরে ঢাকায় আছেন আর রমনা পার্ক চেনেন না?

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, কেমন করে চিনব?

আর সবাই যেভাবে চেনে, আমরা যেভাবে চিনেছি। পয়লা বৈশাখ কত সুন্দর গান হয় সেখানে, বিজ্ঞানী হয়েছেন দেখে এসবের খোঁজখবরও রাখবেন না?

আমার ধমক খেয়ে সফদর আলী একটু নরম হয়ে গেলেন। কেউ যখন আমার উপর কিছু একটা নিয়ে রেগে যায়, আমি তখন উল্টো তার উপর আরো বেশি রেগে যাওয়ার চেষ্টা করি সবসময়, তাহলে তার রাগ কমে আসে। সফদর আলীকে সহজ করানোর জন্যে বললাম, কী দেখলেন পার্কে?

তার মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, একগাল হেসে বললেন, গাছ!

গাছ?

হ্যাঁ, গাছ। সফদর আলীর মুখে হাসি আর ধরে না।

আগে আপনি গাছ দেখেন নি?

দেখব না কেন, গাছ না দেখার কী আছে?

তাহলে?

এবারে অন্যরকমভাবে দেখলাম, কাছে এসে অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে, বলতে বলতে সফদর আলীর মুখে কেমন একটা অপার্থিব হাসি ফুটে ওঠে। গাছ নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসে আমার একটু অবাক লাগে, বাংলাদেশের মানুষ গাছে গাছেই তো বড় হয়, সাহারা মরুভূমি থেকে এলে না হয় একটা কথা ছিল।

আপনি জানেন, সফদর আলী হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বললেন, এক ধরনের গাছ আছে, সেটা লতার মতো। তার কোনো শক্ত কাণ্ড নেই, অন্য গাছ বেয়ে বেয়ে ওঠে—

সফদর আলী ঠাট্টা করছেন কি না বুঝতে পারলাম না, আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম না, ঠাট্টা-তামাশার মানুষ সফদর আলী নন। সত্যিই তিনি লতানো গাছের কথা বলছেন। এমনভাবে বলছেন যেন এই প্রথম বার একটা লতানো গাছ দেখেছেন।

কোনো কোনো লতানো গাছ থেকে আবার শুঁড়ের মতো বের হয়, সেগুলো আবার এটা-সেটা আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে থাকে। মজার ব্যাপার জানেন, সেই শুঁড়গুলো সবসময় একই দিকে পেঁচায়। তার উপর—

সফদর আলী এরপর টানা আধ ঘন্টা উচ্ছ্বাসভরে গাছের কথা বলে গেলেন, আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হল। গাছের পাতার রং সবুজ। কিন্তু ফুলগুলো সবুজ নয়, সেগুলো রঙিন, ফুল থেকে আবার ফল হয়, এই ধরনের কথাবার্তা। না শুনলেও

আমার যে খুব ক্ষতি হত সেরকম বলব না।

সফদর আলীর সাথে এরপর বেশ অনেকদিন দেখা নেই। মাঝে মাঝে তিনি এরকম ডুব মারেন, আমার নিজেরও কাজকর্ম ছিল, তাই আর খোঁজখবর করি নি। গাছপালা নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস কমেছে কি না জানার জন্যে কৌতূহল ছিল। বিজ্ঞানী মানুষ, লোহালক্কড় নিয়ে কারবার, গাছপালা নিয়ে বেশিদিন ব্যস্ত থাকতে পারবেন না তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে আবার যখন তাঁর সাথে দেখা, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেবিলে নানারকম গাছের পাতা বিছানো, হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছের পাতাগুলো লক্ষ করছেন। হাতে একটা নোটবুক, একটু পরে পরে সেখানে তিনি কী যেন টুকে রাখছেন। পাশের চায়ের কাপে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, তাঁর চুমুক দেবার কথা মনে নেই। আমি সামনের চেয়ারে বসলাম, তিনি লক্ষ পর্যন্ত করলেন না। একটু কেশে ডাকলাম, সফদর সাহেব—

তিনি ভীষণ চমকে উঠে গাছের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করলেন, হাতের ধাক্কায় চায়ের কাপ উল্টে সারা টেবিল চায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

নাহ্, কিছু না। সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সাবধানে টেবিল থেকে গাছের পাতাগুলো তুলে নোটবুকের ভেতর রাখতে রাখতে বললেন, জীবজন্তু থেকে গাছ আরো বেশি কাজের। গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সফদর আলী কী বলতে চাইছেন। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, একটা গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করছে, চুলোয় ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাছ কুটতে বসেছে। দৃশ্যটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। একটু ইতস্তত করে বললাম, গাছ আবার নিজের খাবার নিজে তৈরি করে কী ভাবে? আমি যতদূর জানি মানুষ শুধু নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে। সবাই অবশ্যি পারে না, আমি রান্না করলে সেটা—

ধেৎ! আমাকে থামিয়ে দিয়ে সফদর আলী বললেন, আমি কি রান্না করার কথা বলছি? আমি বলছি খাবার তৈরি করা। বুঝতে পারলেন না?

আমি মাথা নাড়লাম, সত্যিই বুঝি নি। সফদর আলী হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষ কী খায়?

সেটা নির্ভর করে কী রকম মানুষ, তার উপর। যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা মাছ, মাংস, দুধ, ফলমূল খায়, যাদের নেই তারা ডাল-ভাত পেলেই খুশি।

ঠিক আছে, ডাল-ভাত দিয়ে শুরু করা যাক, আপনি ডাল-ভাত তৈরি করতে পারবেন?

না।

কিন্তু গাছ পারে, ডাল আর ভাত গাছ থেকেই এসেছে।

আমরা তো মাছও খাই, মাছ তো গাছ থেকে আসে না। দেখেছেন কখনো "মাছ

গাছ"?

কিন্তু মাছ কী খেয়ে বড় হয়?

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, বড় মাছ ছোট মাছদের খায়।

ঠিক আছে, ছোট মাছরা কী খায়? খুঁজে দেখেন সেগুলো শ্যাওলাজাতীয় কোনো এক ধরনের গাছ খেয়ে বড় হচ্ছে। আপনি মাংস খান, মাংস কোথা থেকে এসেছে? গরু থেকে। গরু কী খেয়ে বড় হয়? ঘাস খেয়ে। আপনি যেটাই দেখবেন সেটাই ঘুরেফিরে গাছপালার উপর বেঁচে আছে। কিন্তু গাছপালা? তারা কী খেয়ে বড় হচ্ছে? পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেড, সেটা দিয়ে সারা পৃথিবী বেঁচে আছে। পারবেন আপনি কার্বোহাইড্রেড তৈরি করতে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পানির সাথে চিনি আর লেবুর রস দিয়ে শরবত তৈরি করতে পারি, কিন্তু কার্বোহাইড্রেড? অসম্ভব।

পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী এখনো পারে নি, সালোকসংশ্লেষণ দিয়ে গাছ শুধু যে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করে তাই নয়, গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করে, সেই অক্সিজেন না থাকলে কবে আমি আর আপনি দম বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যেতাম! সালোকসংশ্লেষণ কী ভাবে হয় জানেন?

সফদর আলী এরপর ঝাড়া আধ ঘন্টা লেকচার দিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানীদের এই হচ্ছে সমস্যা, নতুন কিছু শিখলে সেটা অন্যদের না শিখিয়ে ছাড়বেন না।

সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ সফদর আলীর একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির, টেলিগ্রামে লেখা "মহা আবিষ্কার"। ব্যস, শুধু এই দুটো শব্দ। এর আগেও কিছু নেই, এর পরেও কিছু নেই। সফদর আলীর কাণ্ডকারখানা দেখে আজকাল একটু অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এমন কিছু অবাক হলাম না। মহা আবিষ্কারটা কী হতে পারে ঠিক ধরতে পারছিলাম না। গাছ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন, তাই সম্ভবত গাছসংক্রান্ত কিছু একটা হবে। কে জানে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে কার্বোহাইড্রেড বানানো শুরু করেছেন কি না। ঠিক করলাম অফিস ফেরত আজ তাঁর বাসা হয়ে আসব। সফদর আলী যদি দাবি করেন মহা আবিষ্কার, আবিষ্কারটা সাংঘাতিক কিছু না হয়ে যায় না।

বাসা খুঁজে বের করে দরজায় শব্দ করতেই ভেতর থেকে একাধিক কুকুর প্রচণ্ড শব্দ করে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। আমি ভালো করেই জানি বাসায় কোনো কুকুর নেই। বাইরের লোকদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থা, তবু ঠিক সাহস হয় না, কুকুরকে আমার ভারি ভয়।

দরজা খুলে গেল। ভাবলাম সফদর আলীর মাথা উঁকি দেবে। কিন্তু উঁকি দিল জংবাহাদুরের মাথা। আমাকে দেখে দরজাটা হাট করে খুলে মুখ খিঁচিয়ে একটা হাসি দেবার ভঙ্গি করল বুড়ো বানরটা। নেহায়েত জংবাহাদুরকে চিনি। এছাড়া মুখ খিঁচিয়ে ওরকম ভঙ্গি করাকে হাসি মনে করার কোনো কারণ নেই। আতিথেয়তায় জংবাহাদুরের তুলনা নেই, আমাকে প্রায় হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। ভেতরে আবছা

অন্ধকার। একটা জানালা খোলা। সেখানে একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ নিয়ে সফদর আলী কী একটা করছিলেন, আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে ওঠেন। সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চোখ দুটি মনে হয় জ্বলজ্বল করছে। বললেন, ইকবাল সাহেব, মহা আবিষ্কার করে ফেলেছি!

তাই নাকি? আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কী আবিষ্কার?

বলছি, তার আগে চা খাওয়া যাক। সফদর আলী জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে পা দুলিয়ে বসে ছিল। সফদর আলীর কথাটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা কীরকম পাজি দেখেছেন?

আহা বেচারা! হয়তো কাজকর্ম করে কাহিল হয়ে পড়েছে।

কিসের কাহিল, সবকিছুতে ফাঁকিবাজি। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি মজা! সফদর আলী আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে জংবাহাদুর, চা যদি বানাতে না চাও বানিও না, তবে আজ রাতে টেলিভিশন বন্ধ।

বলামাত্র জংবাহাদুরের চোখ খুলে যায়। তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে; তারপর মুখে কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে দ্রুত ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে।

আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে ছিলাম, অবাক হয়ে বললাম, টেলিভিশন দেখা এত পছন্দ করে?

সবদিন নয়। আজ রাতে বাংলা সিনেমা আছে তো! চলেন, আপনাকে দেখাই আমার আবিষ্কার।

সফদর আলী আমাকে টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে টবে সেই মানি প্লান্ট গাছটা। গাছটাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সাধারণ একটা গাছ। আবিষ্কারটি কী বুঝতে না পেরে বললাম, কী দেখব?

আমার আবিষ্কার।

কোথায়?

দেখছেন না?

আমি আবার তাকিয়ে দেখি, একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ, অস্বাভাবিক কিছু নেই। আবিষ্কারটি কী হতে পারে, গাছটার কি চোখ-নাক-মুখ আছে? খুঁজে দেখলাম নেই, তাহলে কি টবটা কোনো রাসায়নিক জিনিস দিয়ে বোঝাই? না, তাও নয়, তাহলে কী হতে পারে? মাথা চুলকে বললাম, না সফদর সাহেব, ধরতে পারছি না।

ধরতে পারছেন না? সফদর আলী একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, দেখছেন না মানি-প্লান্টটা কেমন জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

তা তো দেখছি, ওদিকে রোদ, ওদিকেই তো যাবে।

সফদর আলীর মাথায় বাজ পড়লেও তিনি এত অবাক হতেন না। চোখ বড় বড় করে বললেন, আপনি জানেন এটা?

না জানার কী আছে। সবাই জানে। ঘরের ভেতরে গাছ থাকলে যেদিকে আলো, গাছ সেদিকে বাড়তে থাকে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটাই কী আপনার

আবিষ্কার?

সফদর আলী দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, হ্যাঁ।

আমার তাঁর জন্যে মায়া হল। বেচারা একা একা থাকে। কোনো কিছু খোঁজখবর রাখেন না। যেটা সবাই জানে সেটা তাঁকে একা একা আবিষ্কার করতে হয়। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেন্সিং ফিডব্যাকও আবিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আরো ভাবলাম—

কী বললেন? সেন্সিং কী জিনিস?

সেন্সিং ফিডব্যাক।

সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কোনদিকে আলো আছে গাছ সেটা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, গাছ সেদিকে যাওয়ারও চেষ্টা করে। কাজেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে যদি সেটা বুঝে নেয়া যায় তাহলে গাছকে সেদিকে যেতে সাহায্য করা যায়। গাছের টবটা থাকবে একটা গাড়ির উপর, গাড়ির কন্ট্রোল থাকবে গাছের উপর—

আমি সফদর আলীকে থামিয়ে দিলাম, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, গাছ গাড়িটাকে চালাবে? অন্ধকারে রেখে দিলে গাছ গাড়িটাকে চালিয়ে রোদে এসে দাঁড়াবে?

হ্যাঁ।

গাছের কি হাত-পা আছে যে গাড়িকে চালাবে?

আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি ফিডব্যাক। গাছের পাতায়, ডালে ছোট-ছোট "সেন্সিং প্রোব" থাকবে। পাতা যদি ডান দিকে বেঁকে যাওয়ার চেষ্টা করে, "সেন্সিং প্রোব" সেটা অনুভব করে গাড়িটাকে ডান দিকে চালিয়ে নেবে। কন্ট্রোলটা খুব সহজ নয়, অনেকগুলো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নতুন একটা মাইক্রোপ্রসেসর বের হয়েছে, সেটা দিয়ে সহজেই কন্ট্রোল করা যাবে। এই দেখেন, আমি ডিজাইনটা করেছি—

সফদর আলী একটা বড় কাগজ টেনে নিলেন, সেখানে হিজিবিজি করে অনেক জটিল নকশা আঁকা, দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এখন এই পুরো জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে? সফদর আলী বোঝাতে শুরু করে হঠাৎ কেমন জানি মিইয়ে গিয়ে বললেন, খামাখা সময় নষ্ট করলাম, এসব নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গেছে! পুরনো ঢাকায় গেলে হয়তো এখনি দু' ডজন কিনে ফেলা যাবে!

কী বলছেন আপনি? আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, গাছ রোদের দিকে যায় সেটা সবাই জানে। তাই বলে গাছ গাড়ি চালিয়ে নিজে নিজে রোদের দিকে যাচ্ছে সেটা কখনো শুনি নি।

আপনি সত্যি জানেন?

এক শ' বার জানি। এরকম একটা আবিষ্কার হলে আমি জানতাম না? আমি এক ঘন্টা লাগিয়ে রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

সফদর আলীর মুষড়ে পড়া ভাবটা কেটে যায় হঠাৎ। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলেন, তাহলে এটা তৈরি করা যাক। কী বলেন?

এক শ' বার! আমি হাতে কিল মেরে বললাম, গাড়ি চালিয়ে গাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে

কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি উঠে যাবে আপনার!

সফদর আলী লাজুক মুখে বললেন, খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে কী হবে! কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন তৈরি করা যাক জিনিসটা। খুব সহজ আসলে, আপনাকে বলি কী ভাবে কাজ করবে এটা—

আমি ভয়ে-ভয়ে দেখলাম সফদর আলী কাগজটা টেনে নিচ্ছিলেন আবার, এমন সময় পর্দা ঠেলে জংবাহাদুর এসে ঢুকল। হাতে একটা ট্রে, তার উপর তিন কাপ চা এবং একটি কলা। আমাদের দু'জনের হাতে দুই কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে জংবাহাদুর ইজিচেয়ারে তার নিজের চা এবং কলাটি নিয়ে বসে।

সফদর আলী আড়চোখে দেখে বললেন, বেটা কেমন পাজি দেখেছেন? নিজের জন্যে কলা এনেছে, আমাদের জন্যে কিছু না।

আমি হাত নেড়ে বললাম, আহা-হা ছেড়ে দেন, বেচারা একটা বানর ছাড়া তো আর কিছু নয়, চা যে এনেছে এই বেশি।

ভয়ে ভয়ে আমি চায়ে চুমুক দিয়ে হতবাক হয়ে যাই। চমৎকার সুগন্ধী চা, দুধ চিনি মাপমতো, এতটুকু কম-বেশি নেই। বললাম, বাহ্, চমৎকার চা তৈরি করেছে তো!

সফদর আলী চাপা গলায় বললেন, 'আস্তে বলুন, শুনে ফেললে দেমাকে মাটিতে পা ফেলবে না। তারপর গলা আরো নামিয়ে বললেন, এই একটা জিনিস ভালো করে, এছাড়া ভীষণ আলসে।

আমি আড়চোখে জংবাহাদুরকে লক্ষ করি। চোখ আধবোজা করে বসে আছে, এক হাতে ধূমায়িত চা, অন্য হাতে কলা। কলাটা চায়ে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাচ্ছে, এই দৃশ্য আমি আর কোথায় পেতাম!

সফদর আলীর নতুন আবিষ্কারটি কেমন এগুচ্ছে দেখার জন্যে আজকাল অফিস ফেরত বাসায় যাবার আগে সফদর আলীর বাসা হয়ে যাই। জংবাহাদুরের জন্যে কলাটা-মূলাটা কিনে নিই বলে আজকাল আমাকে দেখলেই চা তৈরি করে আনে। ইদানীং দেখছি আমাকে চায়ের সাথে একটা কলা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাকে খুশি করার জন্যে কলাটা চায়ে ভিজিয়ে খেতে হয়, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ লাগে খেতে!

সফদর আলী পুরোদমে কাজ করছেন। কলকব্জা বোঝাই ছোট একটা গাড়ি তৈরি হয়েছে, উপরে টব রাখার জায়গা। গাড়ি থেকে লাল আর নীল রঙের দুটি তার বের হয়ে এসেছে। লাল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে গাড়িটা সামনে যায়, নিগেটিভ দিলে পিছনে। নীল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে ডান দিকে, নিগেটিভ দিলে বাম দিকে। আমার সামনেই সফদর আলী পরীক্ষা করে দেখেছেন, গাড়িটা ঠিক ঠিক কাজ করে। এখন একটা ছোট ইলেকট্রনিক্সের বাক্স তৈরি করছেন, গাছ সামনে, পিছনে, ডান বা বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে একটা ছোট সেন্সিং প্রোব এই বাক্সটা দিয়ে কী ভাবে জানি ঠিক তারগুলোতে ঠিক ঠিক ভোল্টেজ হাজির করবে। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ সহজই মনে হল।

আরো কয়দিন কেটে গেল, সফদর আলী দিন-রাত কাজ করছেন।

ইলেকট্রনিক্সের অংশটুকু জটিল, সবরকম "আই. সি." নাকি এখানে পাওয়া যায় না। তাই দেরি হচ্ছে। "ডিজিটাল" অংশটুকু তৈরি হয়ে গেছে, ওটা নাকি সহজ। "এনালগ" অংশটুকু এখনো শেষ হয় নি। হাই ফ্রিকোয়েন্সির অসিলেশান নাকি ঝামেলা করছে। আমি এসবের মানে বুঝি না, তাই শুধু শুনে যাই।

যেদিন পুরোটা তৈরি হল, আমার উৎসাহ দেখবে কে! একটা মানি প্লান্ট গাছ দিয়েই শুরু করা হল। টবটা ছোট গাড়িটার ওপর তুলে দিয়ে ছোট ছোট সেন্সিং প্রোবগুলো বিভিন্ন পাতায় লাগিয়ে দেয়া হল। চুষনির মতো জিনিস, চাপ দিয়ে ভেতরে বাতাসটা বের করে দিলে বেশ আটকে থাকে। সফদর আলী গাড়িটার ভেতরে দুটো ব্যাটারি ভরে সুইচ অন করতেই গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে থাকে, তারপর হঠাৎ একটু সামনে গিয়ে থেমে যায়। খানিকক্ষণ থেমে হঠাৎ পিছিয়ে আসে, তারপর আবার সামনে, তারপর আবার পিছনে।

মিনিট পাঁচেক এরকম করল, সফদর আলী চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকেন। আমি ইতস্তত করে বললাম, গাছটা মনস্থির করতে পারছে না মনে হচ্ছে। একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে।

উঁহু। সফদর আলী মাথা নাড়েন, আসলে গেইন ঠিক নেই। ফিডব্যাক লুপটা ঠিক করতে হবে। জংবাহাদুর, একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দাও।

জংবাহাদুর টেলিভিশনে একটা প্রচণ্ড মারামারির দৃশ্যে তন্ময় হয়ে ছিল, নেহায়েত অনিচ্ছায় উঠে এসে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এগিয়ে দেয়। সফদর আলী বললেন, লুপটা ঠিক করতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে, আমি তাই জংবাহাদুরের পাশে বসে টেলিভিশন দেখতে থাকি।

রাত দশটার দিকে সফদর আলী ঘোষণা করেন, তাঁর গাছগাড়ি শেষ হয়েছে। জিনিসটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা দু'জনেই খেয়াল করলাম এখন রাত। রোদ দিয়ে পরীক্ষা করার কোনো বুদ্ধি নেই। টেবিল ল্যাম্পের আলো দিয়ে পরীক্ষা করে কোনো লাভ হল না। গাছটা কাঁপতে থাকে, কিন্তু আলোর দিকে এগিয়ে না এসে মাঝে-মাঝে বরং একটু পিছিয়েই যাচ্ছিল। ঠিক করা হল, পরদিন রোদ উঠলে পরীক্ষা করা হবে। আমি ভোরেই চলে আসব, কাল এমনিতেই আমার অফিস নেই।

পরদিন ভোরে নাস্তা করেই আমি সফদর আলীর বাসায় হাজির হই। বেশ রোদ উঠেছে। গাছগাড়ি পরীক্ষা করায় অসুবিধে হবার কথা নয়। সফদর আলীকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম, মুখ গম্ভীর এবং ভুরু কুঁচকে নিজের গোঁফ টানছেন। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা ঠিক কাজ করে নি। ঘরের এক কোনায় গাছটা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে জানালা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল সফদর সাহেব?

আপনি নিজেই দেখুন, বলে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান। জানালাটা বন্ধ করে প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন। তারপর গাছগাড়িটাকে ঠেলে এনে ঘরের মাঝখানে রাখলেন। এবারে জানালাটা খুলে দিতেই ঘরে রোদ এসে পড়ল। সাথে সাথে গাড়িটা ঘরঘর শব্দ করে পিছিয়ে যেতে থাকে। সফদর আলী জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

সাথে সাথে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। আবার জানালাটা খুলে দিলেন, গাড়িটা আবার রোদ থেকে সরে যেতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, গাছটা গাড়ি চালাচ্ছে।

কিন্তু ভুল দিকে চালাচ্ছে, রোদের দিকে না গিয়ে রোদ থেকে সরে যাচ্ছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, তাতে কী আছে? আপনার সেই লাল তারের ভোল্টেজটা পাল্টে দিলে হয়। যখন পজিটিভ হওয়ার কথা তখন নিগেটিভ, যখন নিগেটিভ হওয়ার কথা তখন পজিটিভ। তা হলেই যখন পিছন দিকে যাচ্ছে তখন—

ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কোনো কথা বললে বড়রা যেভাবে তার দিকে তাকায়, সফদর আলী ঠিক সেভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বিজ্ঞান মানে কি?

আমি হঠাৎ এরকম গুরুতর প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। সফদর আলী আহত গলায় বললেন, কোনো একটা জিনিসকে অন্ধের মতো কাজ করানো তো বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান হচ্ছে বোঝা ব্যাপারটা কী হচ্ছে, বুঝে তারপর কাজ করা। বোকার মতো ভোল্টেজ পাল্টে দিলেই তো হয় না, তাহলে সেটা তো আর বিজ্ঞান থাকে না, সেটা তাহলে জাদু হয়ে যায়।

এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক কথা বলার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল, আমি তাঁর কথাগুলো হজম করে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। সফদর আলী বিজ্ঞান এবং মানুষের প্রকৃতির ওপর ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিকেলের দিকে আবার আসব বলে উঠে এলাম। আজ আবার বাজার করার কথা, দেরি হলে কিছু আর পাওয়া যাবে না।

বিকেলে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছে দেখি বাসা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। সারা ঘরে ভাঙা পেয়ালা, পিরিচ, বাসনকোসন, বইপত্র ছড়ানো, চারদিকে পানি থৈথৈ করছে। ঘরে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য মারবেল, এক কোনায় একটা বড় তক্তা। আমাকে দেখে সফদর আলী হৈহৈ করে উঠলেন। বের করে ফেলেছি সমাধান!

কিসের সমাধান?

গাছগাড়ি উল্টোদিকে যাচ্ছিল কেন।

সত্যি? আমি সাবধানে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালাম, কেন যাচ্ছিল উল্টোদিকে?

আপনাকে চাক্ষুষ দেখাই, বলে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দেন, নিচে নেমে আস, জংবাহাদুর!

আমি উপরে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যাই, জংবাহাদুর বাসার ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে।

নেমে আস বলছি।

জংবাহাদুর নেমে আসার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং কুঁই কুঁই করে প্রতিবাদ করে কী একটা বলল।

নেমে আস, এছাড়া তোমার টেলিভিশন দেখা বন্ধ।

জংবাহাদুর তবু নেমে আসল না। দেখে বুঝতে পারি ব্যাপার গুরুতর। আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখাতে চাইছেন?

জংবাহাদুর নেমে না এলে দেখাই কেমন করে? সফদর আলী এদিকে সেদিকে

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকান, তাঁর চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল মেরে বললেন, এই তো আপনি আছেন, আপনি দেখাতে পারবেন।

যে জিনিস জংবাহাদুর করতে চাইছে না সেটা আমি গলা বাড়িয়ে করতে যাব, এত বোকা আমি নই, কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি সফদর আলী ঘরে ছড়ানো–ছিটানো মারবেলগুলো একত্র করে তার ওপরে তক্তাটা বসিয়ে আমাকে টেনে–হিঁচড়ে তার ওপর তুলে ফেলেছেন।

তক্তার নিচে মারবেলগুলো কাজ করছে বল বিয়ারিঙের মতো। সাবধানে আমাকে ধরে রেখে সফদর আলী বললেন, তক্তাটি এখন খুব সহজে গড়িয়ে যাবে, কাজেই আপনি সাবধানে নড়াচড়া করবেন।

আমি চিৎকার করে নেমে পড়তে যাব, তার আগেই সফদর আলী আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সাবধান! একটু অসাবধান হলেই কিন্তু আছড়ে পড়বেন।

আমি নাক–মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে তক্তার উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় পায়ের নিচে পৃথিবী টলটলায়মান। একটু অসতর্ক হলেই একেবারে পপাত ধরণীতল! সফদর আলী কোথা থেকে একটা কলা তুলে নিয়ে আমার নাকের সামনে ঝুলিয়ে ধরে বললেন, মনে করুন আপনি জংবাহাদুর।

ব্যাপারটা সহজ নয়, তবু চেষ্টা করলাম।

এবারে কলাটা নেয়ার জন্যে এগিয়ে আসুন।

আমি কলাটি ধরার জন্যে একটু এগুতেই শরীরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকে এল, ম্যাজিকের মতো নিচের অংশ গেল পিছিয়ে। আমি তক্তার ওপর তাল সামলানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি, কিন্তু কিছু বোঝার আগে আমাকে নিয়ে তক্তা মারবেলের উপর প্রচণ্ড বেগে পিছনে গড়িয়ে যায়। আমি হাতের কাছে যা আসে তাই ধরার চেষ্টা করতে থাকি। একটা ছোট আলমারি ছিল, তাই ধরে ঝুলে পড়লাম। কিন্তু লাভ হল না, আলমারিসহ প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে পড়ি। মনে হল শরীরের সব হাড়গোড় ভেঙে গেছে, নাড়িভুঁড়ি ফেঁসে গেছে, ঘিলু মাথা ফেটে বের হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে। চোখের সামনে নানা রঙের আলো খেলা করতে থাকে। হলুদ রঙের প্রাধান্যই বেশি। প্রথমে ভাবলাম, আমি বোধহয় মরেই গেছি, সাবধানে চোখ খুলে দেখি মরি নি, কারণ জংবাহাদুর ঘুলঘুলিতে ঝুলে থেকেই পেট চেপে ধরে প্রচণ্ড হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনে হল বোধহয় মরে গেলেই ভালো ছিল। তাহলে অন্তত এই দৃশ্যটি দেখতে হত না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম উপায় না দেখে। আবার যখন চোখ খুললাম, দেখি মুখের উপর সফদর আলী ঝুঁকে আছেন। শুনলাম তিনি বলছেন, দেখলেন? আপনি সামনে আসার চেষ্টা করছিলেন আর কেমন পিছিয়ে গেলেন! গাছের বেলাতেও একই ব্যাপার, যাকে বলে ভরবেগের সাম্যতা! গাছ চেষ্টা করে সামনে আসতে, কিন্তু যায় পিছিয়ে।

আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে মরে গেলেই ভালো ছিল।

সে রাতে যখন বাসায় ফিরেছি, তখন আমার কপালে এবং হাতে ব্যান্ডেজ। একটা চোখ বুজে আছে, সেটা দিয়ে আপাতত কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে।

কারণ কোমর, হাঁটু এবং গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা।

আমাকে দেখে মা আঁৎকে উঠলেন, সে কী! এ কী চেহারা তোর, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

না, অ্যাকসিডেন্ট না।

তাহলে? মারামারি করেছিস নাকি?

মারামারি করব কেন?

নিশ্চয়ই করেছিস, তা ছাড়া এরকম চেহারা হবে কেন?

বললাম তো মারামারি করি নি।

আবার মিথ্যা কথা বলছিস! এই বয়সে রাস্তায় মারপিট করে এসে আবার আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিস?

বললাম তো মারপিট করি নি।

আমার কথা মা শুনলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, আমি কোথায় যাই গো। এরকম একটা খুনে ছেলেকে পেটে ধরেছি! তোর নানা কত বড় খান্দানী বংশের লোক, আর তার নাতি রাস্তায় গুণ্ডাদের সাথে মারপিট করে আসে—

সফদর আলীর বাসায় সেই রাম আছাড় খাবার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এখন থেকে কোনো অবস্থাতেই আর তাঁর বাসায় যাচ্ছি না। দেখা করতে হলে চায়ের দোকানে দেখা–সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। বিজ্ঞানীরা বড় ভয়ংকর জিনিস, তাদের সাথে আর হাতেকলমে কোনো কাজকর্ম নেই।

সপ্তাহখানেক কেটে গেল, চোখের ফোলা কমেছে। হাত দিয়ে জিনিসপত্র ধরা শুরু করেছি। কোমরের ব্যথাটা এখনো আছে, ডাক্তার বলেছে সারতে সময় নেবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। অফিসে সেকশান অফিসার বললেন, শেয়ালের মাংস খেলে নাকি ব্যথা–বেদনা ভালো হয়ে যায়। আর কয়দিন অপেক্ষা করে হয়তো শেয়াল ধরতে বের হতে হবে। অফিস ফেরত কয়দিন কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে ঢুঁ মেরে গেছি, সফদর আলীর দেখা পাই নি। তাঁর গাছগাড়ির কী হল জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু বাসায় যাওয়ার ভরসা পাচ্ছি না।

দু'সপ্তাহের মাথায় সফদর আলীর সাথে দেখা। আমি চা খেয়ে বের হচ্ছিলাম, দেখি তিনি হেলতে–দুলতে ঢুকছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন, এই যে আপনাকে পাওয়া গেছে, কতদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলুন দেখি, কোন গাছ পোকা খায়?

পোকা খায়? গাছ?

হ্যাঁ, অনেকরকম গাছ পোকা ধরে খায়, জানেন না?

আমার মনে পড়ল কোথায় জানি পড়েছিলাম যে, কিছু কিছু গাছ নাকি পোকা ধরে খায়। একটা গল্পও পড়েছিলাম যে মাদাগাস্কার দ্বীপে একটা গাছ নাকি মানুষ ধরে খেয়ে ফেলত। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি কিছু গাছ নাকি পোকা খায়, কিন্তু সেরকম গাছ তো চিনি না।

তামাক গাছ নাকি পোকা খায়?

তাই নাকি, জানতাম না তো!

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, একটা পোকা-খাওয়া-গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পেয়ে যাই। ওটা একেবারে মাছিটাছি ধরে খেয়ে ফেলে।

কী করবেন ওরকম গাছ দিয়ে?

এখন গাছ গাড়ি চড়ে গান শুনতে যায়, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়, যদি "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পাই—

কী বললেন? আমি চমকে উঠে বললাম, গাছগাড়ি চড়ে কী করে?

কেন? গান শোনে, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়।

গান শোনে?

হ্যাঁ। এত অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি দেখলেন না?

কোথায় দেখলাম?

হঠাৎ সফদর আলীর সবকিছু মনে পড়ে যায়। মাথা নেড়ে বললেন, সেদিন পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার পর তো আপনি আর আসেন নি। বেশি ব্যথা পেয়েছিলেন নাকি?

সফদর আলীর উপর রাগ করে থাকাও মুশকিল। চেপে থাকার চেষ্টা করলাম, তবু গলার স্বরে একটু রাগ প্রকাশ হয়ে গেল, না ব্যথা পাব কেন? বয়স্ক এক জন মানুষ যদি ওভাবে দড়াম করে পাকা মেঝেতে আছড়ে পড়ে, ব্যথা পাবে কেন?

সফদর আলী অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখেছিলাম ওরকম হাবড়ে পড়ে সারা শরীরে ব্যথাটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পুরো চোটটা যদি এক জায়গায় লাগত তাহলে হাড় ভেঙে যেতে পারত।

আমি রাগ লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বললাম, আর ঐ বজ্জাত বানরটা কেমন পেট চেপে ধরে হাসা শুরু করেছিল দেখেছিলেন?

সফদর আলী মাথা নেড়ে বললেন, ওটা আমার দোষ। বানরকে হাসতে শেখানোর কোনো দরকার ছিল না, এখন যখন খুশি হাসতে থাকে। ভদ্রতাজ্ঞানটুকু নেই। আপনি যে আছাড় খেয়ে পড়লেন, দেখে যত হাসিই পাক, জংবাহাদুরের মোটেই হাসা উচিত হয় নি। আমি কি হেসেছিলাম?

আমি স্বীকার করলাম তিনি হাসেন নি। যাই হোক, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, গাছগাড়ির কী হল, বলুন।

সফদর আলী সবকিছু খুলে বললেন। সার্কিটের কানেকশান একটু পরিবর্তন করে দেয়ার পর গাছগাড়ি ঠিক ঠিক কাজ শুরু করেছে। ভোরে রোদ উঠতেই গাছটা রোদে হাজির হয়, আবার রোদটা বেড়ে গেলে রোদ থেকে ছায়ায় সরে যায়। ঘরের এক কোনায় একটু পানি ছেড়ে রেখেছিলেন। গাছ কী ভাবে কী ভাবে সেটা বুঝে নিয়ে দিনে এক বার পানির নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। কোথায় নাকি পড়েছিলেন যে গাছের সাথে কথা বললে নাকি গাছ ভালো থাকে। সফদর আলী কী নিয়ে কথা বলবেন ভেবে পান নি বলে একটা রেকর্ড প্লেয়ারে কিছু গানের ব্যবস্থা করেছেন। গাছটা আজকাল নাকি রীতিমতো গান শুনছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে নাকি গাছটার বিশেষ আকর্ষণ। একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেই গাছ নাকি পড়িমরি করে ছুটে আসে। সফদর আলী আরো গোটা দশেক গাছগাড়ি তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন গাছ বসিয়ে, দেখতে চান কোনটা কী রকম

কাজ করে। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা কোন গাছ কী গান শুনতে পছন্দ করে সেটা বের করা। তিনি নাকি "গাছের সংগীতচর্চা" নাম দিয়ে একটা বই লিখবেন বলে ঠিক করেছেন। আমার পরিচিত কোনো প্রকাশক আছে কি না জানতে চাইলেন। তিনি পোকা খেতে পছন্দ করে এরকম একটা গাছ খুঁজছেন, তাহলে সেই গাছগাড়িতে পোকা মারার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গাছটা তাহলে পোকা মেরে খেতে পারবে। ঘরে তেলাপোকার উপদ্রব থাকলে তো কথাই নেই, একদিনে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সফদর আলীর গাছগাড়ি দেখার কৌতূহল আর আটকে রাখা যাচ্ছিল না। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই ঠিক করা হল পরদিন বিকেলে আলো থাকতে থাকতে তাঁর বাসায় যাব। গাছপালা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আলো ও পানি খুঁজে নিচ্ছে, গান শুনছে—এর থেকে বিচিত্র জিনিস আর কী হতে পারে!

পরদিন বিকালে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি বাসা বাইরে থেকে তালাবন্ধ, ঘরের দরজায় একটা খাম, খামের উপরে আমার নাম লেখা। ভিতরে একটা চিঠি, চিঠিটা এরকম :

সুসংবাদ। ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। জরুরি। চট্টগ্রাম। উদ্ভিদবিদ্যা প্রফেসর। দুঃখিত।

টেলিগ্রাম করে করে তাঁর স্বাভাবিক চিঠি লেখার ক্ষমতা চলে গেছে। তবু বুঝতে অসুবিধে হল না। চট্টগ্রামের কোনো এক উদ্ভিদবিদ্যার প্রফেসর ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ নামের পোকা-খাওয়া-গাছ জোগাড় করে দেবেন বলে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হয়েছে। আমার সাথে দেখা হল না বলে দুঃখিত। আমি একটু নিরাশ হলাম, কিন্তু খুশিও হলাম, সেদিন যেভাবে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের জন্যে হা-হুতাশ করছিলেন যে আমার বেশ খারাপই লাগছিল।

তারপর বেশ কয়দিন সফদর আলীর খোঁজ নেই। তিনি ফিরে এসেছেন কি না জানি না। বাসায় গিয়ে খোঁজ নেব ভাবছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে সময় পাচ্ছি না। তার মধ্যে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এসে হাজির :

ডজন। ভিনাস। হাই ভোল্টেজ।

প্রথম অংশটা বুঝতে পারলাম। তিনি এক ডজন ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ গাছ পেয়েছেন, কিন্তু হাই ভোল্টেজ কথাটি দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারলাম না। যাই হোক, দেরি না করে সেদিনই আমি সফদর আলীর বাসায় গিয়ে হাজির। জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে সফদর আলীর কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর ঘরে অসংখ্য যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ইকবাল সাহেব, দেখে যান কী পেয়েছি।

একটু এগিয়ে দেখি ছোট ছোট বারটা টবে ছোট ছোট বারটা গাছ। গাছের পাতাগুলো ভারি অদ্ভুত, চারদিকে কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে। কোনো কোনো পাতা খোলা, কোনো কোনোটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি বললাম, এই কি সেই ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ?

হ্যাঁ, দেখুন মজা দেখাই।

সফদর আলী টেবিলে রাখা কাঁচা মাংসের খানিকটা কিমা থেকে একটু তুলে নিয়ে গাছের পাতার ওপর ছেড়ে দিলেন। আর কী আশ্চর্য, গাছের পাতাটা ভাঁজ হয়ে বন্ধ হয়ে মাংসটুকু ঢেকে ফেলল! সফদর আলী বললেন, যখন পাতাটা খুলবে, দেখবেন মাংসটুকু নেই।

কখন খুলবে?

সময় লাগবে, মাংস হজম করা তো সহজ নয়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, দুনিয়াতে কত কী যে দেখার আছে, একটা জীবনে তার কতটুকু মাত্র দেখা যায়?

সফদর আলী বললেন, আপনার কাজ না থাকলে সবগুলো গাছকে একটু করে কিমা খাওয়ান দেখি।

যদিও জানি ছোট এইটুকু গাছে ভয় পাবার কিছু নেই, তবু আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। সাবধানে আমি একটু একটু করে কিমা গাছগুলোকে খাওয়াতে থাকি। পাতার ওপরে রাখতেই পাতাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। সফদর আলী খানিকক্ষণ আমাকে লক্ষ করে আবার যন্ত্রপাতির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সেখানে লিখেছেন, হাই ভোল্টেজ, সেটার মানে কি?

সফদর আলী একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, বলেন, বুঝতে পারেন নি?

নাহ্! আমার একটু লজ্জাই লাগে স্বীকার করতে।

আপনাকে বলেছি না ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ, যে গাছগাড়িতে থাকবে সেখানে পোকা মারার ব্যবস্থা থাকবে।

বলেছিলেন। কী ভাবে পোকাগুলোকে মারবে?

হাই ভোল্টেজ দিয়ে।

ও।

একটা লম্বা তার বেরিয়ে আসবে। তারের মাথায় থাকবে বিশ হাজার ভোল্ট। পোকা-মাকড়ের গায়ে লাগতেই প্রচণ্ড স্পার্ক, আর সেটা এসে পড়বে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের উপর, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ তখন কপ কপ করে সেটা খেয়ে নেবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টানোর জন্যে বললাম, আপনার গাছগাড়ি কই? বলছিলেন যে গান শুনতে যায়, দেখাবেন একটু?

সফদর আলী অপ্রতিভের মতো বললেন, ঐ যা! হাই ভোল্টেজের ব্যবস্থা করার জন্যে সবগুলো খুলে ফেলেছি।

তাকিয়ে দেখি বেশ কয়টা গাছগাড়ি, সবগুলোই খোলা। সফদর আলী ভেতরে এখন যন্ত্রপাতি ভরছেন। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কী একটা জিনিস চেপে ধরে বললেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন এগুলো পোকা-মাকড় ধরে বেড়াবে, গান শোনা থেকে সেটা বেশি মজার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ লাগবে?

এই তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে জিনিসটা দাঁড় হল না। প্রচণ্ড হাই ভোল্টেজের স্পার্ক হতেই সেটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের অনেক জায়গায় কী ভাবে জানি ঝামেলা করে ফেলছিল। মাইক্রোপ্রসেসরে ভুল পাল্‌স্‌ এসে সেটাকে নাকি বিভ্রান্ত করে দেয়, কাজেই পুরো সার্কিটটাকে নাকি খুব ভালো করে "শিল্ডিং" করতে হবে। সফদর আলী সবকিছু খুলে আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন, ধৈর্য আছে বটে। আমি আর বসে থেকে কী করব, বাসায় ফিরে এলাম।

বেশ কয়দিন কেটে গেছে, আমি মাঝে মাঝেই খোঁজ নিই। কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীর কাজ শেষ হয় না। যখন শুনি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ করে একটা হাই ভোল্টেজের স্পার্ক আরেকটা ট্রানজিস্টর না হয় আরেকটা আই. সি.-কে পুড়িয়ে দেয়। সফদর আলী তখন আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেন। দেখে-দেখে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিলাম, তখন আবার আমাকে কয়দিনের ছুটি নিতে হল। মা অনেক দিন থেকে বলছেন নেত্রকোনা যাবেন, তাঁকে নিয়ে যাবার লোক নেই। কাজেই প্রায় সপ্তাহখানেক নেত্রকোনায় থেকে যখন ফিরে এসেছি, তখন দেখি আমার নামে বেশ কয়েকটা টেলিগ্রাম, বাসার সবাই সেগুলো খুলে পড়েছে। টেলিগ্রাম হলেই জরুরি খবর ভেবে সেগুলো খুলে ফেলা হয়। টেলিগ্রামগুলো এরকম—

প্রথমটি : কাজ শেষ।
দ্বিতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। হিন্দি গান।
তৃতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। বীভৎস।
চতুর্থটি : জরুরি। রাজশাহী। পিচার প্লান্ট।

বাসার কেউ টেলিগ্রামগুলো পড়ে কিছু বোঝে নি এবং সেটা নিয়ে বেশি মাথাও ঘামায় নি, সবাই জেনে গেছে আমার একজন আধপাগল বন্ধু আছে, সে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুধু টেলিগ্রাম পাঠায়। আমার অবশ্যি টেলিগ্রামগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ বসিয়ে গাড়ি বানানো শেষ হয়েছে, সফদর আলী আমাকে গিয়ে দেখতে বলেছেন। গাছগুলো নিশ্চয়ই হিন্দি গান শুনতে পছন্দ করে এবং যেভাবে পোকা ধরে খাচ্ছে, ব্যাপারটা হয়তো বীভৎস। শেষ টেলিগ্রাম পড়ে মনে হল তিনি জরুরি কাজে রাজশাহী যাচ্ছেন। পিচার প্লান্ট কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না। ডিকশনারি খুলে দেখলাম এটি আরেকটি পোকা—খেকো গাছ। গাছের পাতার নিচে একটা ছোট কলসির মতো থাকে, সেখানে এক ধরনের রস থাকে। পোকা-মাকড় তার লোভে কলসির ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন গাছ কলসির মুখ বন্ধ করে ফেলে। মুখ আবার যখন খোলে তখন ভেতরের পোকা হজম হয়ে গেছে। টেলিগ্রামের পুরো অর্থ এবারে বুঝতে পারলাম। রাজশাহীতে নিশ্চয়ই তিনি এধরনের কোনো গাছের সন্ধান পেয়ে জরুরি নোটিশে চলে গেছেন। সফদর আলী এখানে নেই জেনেও একদিন তাঁর বাসা থেকে ঘুরে এলাম। ঘর তালাবন্ধ। কিন্তু ভেতরে মনে হল খুটখাট শব্দ হচ্ছে। জংবাহাদুরের কুঁই কুঁই আওয়াজও মনে হল শুনলাম কয়েক বার। এদিক-সেদিক দেখে উৎসাহজনক বা সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে বাসায় ফিরে

এলাম।

আরো কয়দিন পরের কথা। আমি অফিসে কাজ করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় শুনি বাইরে সফদর আলীর গলার স্বর। সেক্রেটারির কাছে আমার খোঁজ করছেন। আমি অবাক হয়ে বেরিয়ে এলাম, সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। আমাকে দেখে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব? কবে এলেন?

এই তো, একটু আগে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে।

কেন? কী হয়েছে?

জানি না। স্টেশন থেকে বাসায় পৌঁছে যেই দরজা খুলেছি, চিৎকার করতে–করতে জংবাহাদুর বেরিয়ে এসে বাসার কার্নিশে উঠে গিয়ে বসে পড়ল। আমি যতই ডাকি, কিছুতেই নিচে নামতে চায় না। ভেতরে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে।

কী দেখে?

বুঝতে পারলাম না, ভয় পাবার মতো কিছু তো নেই বাসায়।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

সেগুলোতে ভয় পাবার কী আছে? যেভাবে পোকা মারে, দেখে একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগে। কিন্তু ভয় পাবার তো কিছুই নেই।

এখন কী করতে চান?

বাসায় জিনিসগুলো রেখে কোনোমতে চলে এসেছি। আপনাকে নিয়ে এখন যাব। একা একা যেতে সাহস পাচ্ছি না।

অফিস প্রায় ছুটি হয়েই গেছে, আমি কাগজপত্র গুছিয়ে সফদর আলীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। সফদর আলী জানালেন, রাজশাহী গিয়ে কোনো লাভ হয় নি। যে বলেছিল তাঁকে পিচার প্লান্ট জোগাড় করে দেবে, সে জোগাড় করে দিতে পারল না। সেখানে শুনলেন, বগুড়াতে এক নার্সারিতে নাকি আছে। সেখানে গিয়েও পেলেন না। ঘোরাঘুরিই হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি।

রিকশা করে তাঁর বাসায় পৌঁছুতে–পৌঁছুতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। শীতের বিকেল, রোদ পড়ে আসছে দ্রুত। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে। এক সোয়েটারে শীত মানতে চায় না। সফদর আলীর বাসার সামনে দেখলাম একটা ছোটখাট ভিড়। বুঝতে অসুবিধে হল না ভিড়টি জংবাহাদুরের সৌজন্যে। লোকজনের ভিড় দেখলে জংবাহাদুর যে নিজে থেকেই খেলা দেখাতে শুরু করে, সেটা শিখেছি অনেক মূল্য দিয়ে। আজ অবশ্যি সেরকম কিছু নয়। জংবাহাদুরের মেজাজ–মরজি সুবিধের নয়, উপস্থিত লোকজনকে মাঝে–মাঝে ভেংচি কাটা ছাড়া আর কিছুতেই উৎসাহ নেই। উপস্থিত লোকজন অবশ্যি তাতেই খুশি। আমাদের দেখে সে দাঁত–মুখ খিঁচিয়ে কী–কী বলতে শুরু করে। বানরের ভাষা আছে কি না কে জানে, থাকলেও সেটা আমাদের জানা নেই। কাজেই জংবাহাদুর ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম না। আমরা যখন দরজা খুলে ঢুকব, তখন সে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু বানরের কথা শুনে তো আর জগৎসংসার চলতে পারে না। আমরা তাই তালা খুলে সাবধানে ঘরের

ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে আবছা অন্ধকার, ভালো করে দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিতেই বাতি জ্বলে উঠল। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, অন্ধকারে সবসময় সুইচ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যবস্থা। শব্দ দিয়ে সুইচ অন করা।

ঘরের ভিতর ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র, এছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব নেই। বোঝা যায় এটা জংবাহাদুরের ঘর। পাশের ঘরে একটু খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওঘরে কি ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

হ্যাঁ, চলুন যাই।

আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। বললাম, লাঠিসোঁটা কিছু একটা নিয়ে গেলে হয় না?

সফদর আলী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েও কী মনে করে একটা লোহার রড তুলে নিলেন। আমরা দু'জন পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরে কিছু নেই, আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিলেন, কিন্তু বাতি জ্বলল না। আবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাভ হল না। আমিও চেষ্টা করি, কিন্তু বাতি আর জ্বলল না। সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আবার বাল্‌বটা ফিউজ হয়েছে।

আমি অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো কোথায়?

ঐ তো। সফদর আলী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের ঘিরে দেয়াল ঘেঁষে চারদিকে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু দেখেই আমার মনে হল সবগুলো বাজে মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কী জানি! সার্কিট কেটে গেছে হয়তো—সফদর আলীর কথা শেষ হবার আগেই ডানপাশে একটা গাছগাড়িতে দুটো বাতি জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাতি দুটি পিটপিট করতে থাকে। দেখে মনে হয় এক জোড়া চোখ। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, ওটা কি?

বাতি।

চোখের মতো লাগছে দেখি, পিটপিট করছে কেন?

না, চোখ নয়। পোকা-মাকড় আলো দেখলে এগিয়ে আসে। তাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, গাছগাড়ি পোকা-মাকড় ধরতে হলে বাতি জ্বালিয়ে নেয়।

কিন্তু দেখুন আপনি, কেমন পিটপিট করছে, ঠিক চোখের মতো।

সফদর আলী দুর্বলভাবে হেসে বললেন, ঠাট্টা করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, দেখতে চোখের মতো দেখায় কিনা!

ঠিক এই সময় চোখ জোড়া ঘুরে আমাদের ওপর এসে পড়ে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, আমাদের উপর আলো ফেলছে কেন?

কী জানি! আমাদের পোকা ভাবছে নাকি?

আমি ভয়ে-ভয়ে ভাঁটার মতো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ দেখি সেটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, সফদর সাহেব, চলুন পালাই।

ভয়ের কী আছে! একটা গাছই তো।

আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কেন? আমার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। খেয়ে তো ফেলতে পারবে না—সফদর আলী সাহস দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু গলার স্বরে বোঝা গেল তিনি নিজেও একটু ভয় পেয়েছেন। গাছটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি খেয়াল করলাম, ওটার সামনে দিয়ে শুঁড়ের মতো কী একটা যেন বের হয়ে আছে। ফুট চারেক উঁচু। সেটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শুঁড়ের মতো ওটা কি?

সফদর আলী ঢোক গিলে বললেন, ওটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে পোকা মারার জন্যে। ওটাতেই হাই ভোল্টেজ।

ওটা বের করে এগিয়ে আসছে কেন?

মনে হয় আমাদের শক মারতে চায়।

সর্বনাশ! আমি আঁৎকে উঠে বললাম, চলুন পালাই।

চলুন। সফদর আলী হঠাৎ করে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা দু'জন ঘুরে দাঁড়াই, দরজার দিকে এগুতেই হঠাৎ আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল, দুটি গাছ গুটি গুটি দরজার সামনে এগিয়ে এসেছে। আমরা ঘুরতেই তাদের ভাঁটার মতো দুটি চোখ জ্বলে উঠল। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রিক শক দেয়ার শুঁড়টা দোলাতে দোলাতে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। আমি সফদর আলীর দিকে তাকালাম, এখন?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, বাম দিকে চেষ্টা করি, ঐ জানালার ওপরে উঠে—

চেষ্টা করার আগেই বাম দিকে, ডান দিকে, সামনে, পিছনে গাছগুলোর চোখ জ্বলে উঠতে থাকে। আমরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেলাম। এবারে গাছগুলো শুঁড় দুলিয়ে আস্তে-আস্তে এগুতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটি শুঁড় থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে।

ভয়ে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার মতো অবস্থা। সফদর আলীর হাত চেপে ধরে বললাম, এখন?

সফদর আলী ভাঙা গলায় বললেন, ঝামেলা হয়ে গেল।

ঝামেলা। ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে না ফেলে আমাদের!

না, মারতে পারবে না, ভোল্টেজ বেশি হলেও পাওয়ার খুব কম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললেন, সবগুলো যদি একসাথে আক্রমণ করে তাহলে অবশ্যি অন্য কথা।

সবগুলো তো একসাথেই আসছে। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, হাতের রডটা দিয়ে দেন না কয়েকটা ঘা।

সফদর আলী লোহার রডটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, কাঠের হলে একটা কথা ছিল, এটা দিয়ে শক লেগে যাবে।

আমি বললাম, রুমাল দিয়ে ধরে নিন।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলেছেন। আমি আমার পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিই, তিনি নিজেরটাও বের করে নেন। দুটি দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে লোহার রডটা ধরে সফদর আলী এক পা এগিয়ে যান। গাছগুলো হঠাৎ থমকে

দাঁড়ায়। তারপর বেশিরভাগ সফদর আলীকে ঘিরে দাঁড়ায়। সফদর আলীও দাঁড়িয়ে পড়েন ভয়ে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তিনি আরেকটু এগিয়ে যান, আর হঠাৎ গাছগুলো তার দিকে ছুটে আসে। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, ঠিক জ্যান্ত প্রাণীর মতো গাছগুলো সফদর আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চটাশ চটাশ করে সে কী ভয়ানক স্পার্ক! আমি শুনলাম, সফদর আলী একবার ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠে হাতের রডটা ঘুরিয়ে এক ঘা মেরে বসলেন। একটা গাছ মনে হল কাবু হয়ে গেল। অন্যগুলো কিন্তু হাল না ছেড়ে তার পিছনে লেগে থাকে।

আমার সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাকিয়ে দেখি, সফদর আলীকে আক্রমণ করতে গিয়ে গাছগুলো খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, একটা লাফ দিলে হয়তো দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। দেরি না করে খোদার নাম নিয়ে আমি একটা লাফ দিয়ে বসি, শেষবার লাফ দিয়েছিলাম সেই ছেলেবেলায়, কত দিনের অনভ্যাস, লুটোপুটি খেয়ে কোনোমতে দরজার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়াব, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পিছনে কী একটা যেন আছড়ে পড়ল, সাথে-সাথে কী ভয়ানক একটা ইলেকট্রিক শক! মনে হল পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কেউ যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। গোঙানোর মতো একটা শব্দ করে আরেক লাফ দিয়ে দরজার বাইরে এসে আছড়ে পড়লাম।

খানিকক্ষণ লাগল সোজা হয়ে দাঁড়াতে। গাছগুলো দরজা পার হয়ে এপাশে আসতে পারবে না। ছোট একটা কাঠের পার্টিশান আছে। গাছগাড়ির চাকা আটকে যাবে সেখানে।

ঘরের ভেতর থেকে সফদর আলীর আরেকটা চিৎকার শুনতে পেলাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোমর চেপে বসে পড়তে হল, কোথায় জানি ভীষণ লেগেছে। সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিই, সফদর আলী জানালা ধরে ঝুলে আছেন। গাছগুলো নিচে এসে জড়ো হয়ে শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে ঝুলে থাকতে পারবেন? কিছু একটা করতে হয়, আমি এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ব্যবহার করার মতো কিছু না পেয়ে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এগিয়ে যাই। ভেতর থেকে সফদর আলী চিঁ চিঁ করে ডাকলেন, ইকবাল সাহেব।

কি?

দৌড়ে আধসের মাংস কিনে আনুন।

মাংস? কেন?

গাছগুলোকে খাওয়াতে হবে।

ততক্ষণ ঝুলে থাকতে পারবেন?

পারতে হবে, আপনি দৌড়ান।

আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ালাম। আশেপাশে কোনো মাংসের দোকান নেই। একটা রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারকে অনেক বুঝিয়ে রান্না করা হয় নি এরকম খানিকটা মাংস দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনে আবার দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি।

সফদর আলী তখনো জানালা ধরে ঝুলে আছেন। আমাকে দেখে চিঁ চিঁ করে বললেন, এতক্ষণ লাগল! দরদাম না করলে কী হত?

আমি রেগে বললাম, কে বলল আমি দরদাম করছিলাম?

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বলেন, সবসময় তো করেন।

আমি রাগ এবং ব্যথা দুটিই চেপে রেখে বললাম, কী করব এখন মাংসগুলো?

ছুড়ে দিন গাছগুলোর দিকে।

আমি ছুড়ে দিলাম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল মাংসগুলো। গাছগুলো ঘুরে গেল সাথে সাথে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাংসের টুকরোগুলোর ওপর। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর চুপচাপ হয়ে যায়। গাছের পাতাগুলো আঁকড়ে ধরে মাংসের টুকরোগুলোকে।

সাবধানে জানালা থেকে নেমে আসেন সফদর আলী। গাছগুলো মাংস খেতে ব্যস্ত, তার দিকে ঘুরেও তাকাল না। সফদর আলীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কোনোমতে হেঁটে এসে একেবারে শুয়ে পড়েন মেঝেতে। আমি খুঁজে পেতে একটা খবরের কাগজ এনে তাঁকে বাতাস করতে থাকি। আমার নিজের অবস্থাও খারাপ। একটা চোখ আবার বুজে আসছে। কুনইয়ের কাছে কোথায় জানি ছাল উঠে গেছে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে অনেকক্ষণ থেকে।

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বললেন, কাল থেকে সব গাছ মাটিতে। আর গাড়ি-ঘোড়া নয়—

আমি বললাম, কবি কি খামাখা বলেছেন—

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

গাছ থাকবে মাটির ওপর, গাড়িতে না ঘুরে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কবি লিখেছে এটা?

আমি উত্তর দেয়ার আগেই নিজেই বললেন, নিশ্চয়ই কবিগুরু। কবিগুরু ছাড়া এরকম খাঁটি জিনিস আর কে লিখবে?

সে-রাতে দু'হাতে ব্যান্ডেজ এবং বুজে যাওয়া চোখ নিয়ে যখন বাসায় ফিরে আসি, আমার মা দেখেই আঁৎকে ওঠেন। কী হয়েছে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা, কী সর্বনাশ, ছেলে আবার গুণ্ডা পিটিয়ে এসেছে গো—

আমি এবারে প্রতিবাদ পর্যন্ত করলাম না। করে কী হবে?

পীরবাবা

আমাদের অফিসটি একটি বিচিত্র জায়গা। দিনে দিনে সেটি আরো বিচিত্র হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। একদিন সকালে অফিসে এসে দেখি সেকশন অফিসার ইদরিস সাহেব খালি গায়ে একটা ছোট হাফ প্যান্ট পরে ডান পা-টা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে একটা কৌতূহলী ছোট ভিড়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম বড়

সাহেবের পিঠে ব্যথা শুনে ইদরিস সাহেব এই যোগাসনটি প্রেসক্রিপশান করেছেন, প্রতিদিন ভোরে আধঘন্টা করে করতে হবে। আরেক দিন দুপুরবেলা দেখি অফিসের মাঝখানে কেরোসিনের চুলোর ওপর একটা ডেকচিতে টগবগ করে পানি ফুটছে, সেখানে মাওলা সাহেব কী–সব গাছগাছড়া ছেড়ে দিচ্ছেন। সেটি থেকে কী একটা অব্যর্থ মলম তৈরি হবে। টাকমাথায় চুল গজাতে এই মলমের নাকি কোনো তুলনা নেই। মলমটি তৈরি হচ্ছে আমাদের বৃদ্ধ অ্যাকাউন্টেন্টের জন্যে। তাঁর মাথায় বিস্তৃত টাক এবং শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি আরেক বার বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রতিদিন ভোরে অফিস শুরু হওয়ার আগে জলিল সাহেবের কাছে কেউ–না–কেউ আসবেই। তিনি স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারেন। একদিন এসে দেখি আমাদের টাইপিস্ট মেয়েটি তাঁর সামনের চেয়ারে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। সে নাকি স্বপ্নে দেখেছে তার মা সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে। জলিল সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, কাঁদার কিছু হয় নি মা, মৃত্যু স্বপ্ন হচ্ছে সুখস্বপ্ন। তোমার মায়ের হায়াত দশ বছর বেড়ে গেল। শুধু মনে করার চেষ্টা কর দেখি, সাপটা কি মদ্দা ছিল না মাদী সাপ ছিল?

বিচিত্র লোকজন নিয়ে বিচিত্র জায়গা এই অফিসটি। আমার বেশ লাগে। এর মধ্যে আমাদের সেকশন অফিসার মাওলা সাহেব একদিন এক পীরের মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের নাম হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী। নামটা উচ্চারণ করার সময় গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বের করতে হয়, আমি পাঁচ বার চেষ্টা করে মাওলা সাহেবের অনুমোদন পেলাম। মাওলা সাহেব আমাদের সামনে তাঁর পীরকে "শাহে হযরত" না হয় "হুজুরে বাবা" বলে সম্বোধন করেন। প্রথম সপ্তাহ আমাদের তাঁর কাছ থেকে শুধু চেহারার বর্ণনা শুনতে হল। ছয় ফুট উঁচু, নূরানী চেহারা, গায়ের রং ধবধবে সাদা। গালের কাছে নাকি একটু গোলাপি আভা। মসলিনের মতো সাদা দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথায় সিল্কের পাগড়ি। পরনে সাদা আচকান, সাদা লুঙ্গি, পায়ে জরির জুতো। হুজুরের দাড়ি থেকে নাকি জ্যোতির মতো আলো ছড়ায়। গলার স্বর মধুর মতো মিঠা। যখন কথা বলেন তখন গলার স্বর শুনে "দিল" ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মুরীদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঁচ লাখ, কেউ বলে দশ লাখ, আবার কেউ বলে মাত্র পঞ্চাশ। কারণ, খাঁটি নেকবন্দ লোক না হলে তিনি নাকি মুরীদ নেন না। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর কথা বলতে বলতে মাওলা সাহেবের প্রত্যেক দিন অফিসের কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যায়।

প্রত্যেকদিন ভোরেই মাওলা সাহেবের কাছ থেকে আমরা হযরত শাহ্ কুতুবপুরীর খবরাখবর পেতে থাকি। একদিন শুনতে পেলাম, কোন কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা বিধিয়ে ফেলেছেন। যন্ত্রণায় যখন কাটা মুরগির মতো ছটফট করছেন, তখন আত্মীয়স্বজন ধরাধরি করে শাহ্ কুতুবপুরীর কাছে নিয়ে এল। শাহ্ কুতুবপুরী গলায় হাত দিয়ে বললেন, কোথায় তোর মাছের কাঁটা? চিফ ইঞ্জিনিয়ার কথা বলতে গিয়ে কেশে ফেললেন। ছয় ইঞ্চি লম্বা মাছের কাঁটা বের হয়ে এল কাশির সাথে। বিশ্বাস না হলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসা যায়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বউ নাকি সেই কাঁটা ফ্রেম করে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রেখেছেন।

মাছের কাঁটার গল্প পুরানো হওয়ার আগেই মাওলা সাহেব নতুন একটা ঘটনা

শুনিয়ে দেন। স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ছয় বছর আগে। স্ত্রীর আহার নেই, নিদ্রা নেই, শাহ্ কুতুবপুরীর পায়ে এসে পড়ল একদিন। বলল, বাবা, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেন। শাহ্ কুতুবপুরী বললেন, মা, হায়াত-মউত খোদার হাতে, তবে তোর স্বামী যদি জিন্দা থাকে, তাকে তুই দেখবি। শাহ্ কুতুবপুরী তখন চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর শুধু হুঁ-উ-উ-উ-উ-ক করে একটা হুঙ্কার শোনা যায়। দুই ঘন্টা পর চোখ খুললেন কুতুবপুরী। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। বললেন, যা, তোর কোনো ভয় নেই, তোর স্বামী জিন্দা আছে। এক কাফির তাকে জাদু করে রেখেছিল পাহাড়ের উপর, হুজুর তাকে জাদু কেটে মুক্ত করে দিয়েছেন। সে রওনা দিয়েছে এদিকে। কাল ভোরে এসে পৌছে যাবে। পরদিন লোকে লোকারণ্য, তার মাঝে দেখা গেল ছয় বছর পর স্বামী ফিরে আসছে। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি, বড়-বড় নখ। নাপিত চুল-দাড়ি কেটে দিতেই আগের চেহারা।

মাওলা সাহেব নিজের চোখে দেখেন নি, কিন্তু হুজুরের বড় সাগরেদের কাছে শোনা, ফিরিশতার মতো লোক, তাঁকে অবিশ্বাস করেন কেমন করে?

বেশ চলছিল এভাবে, কিন্তু আস্তে-আস্তে গোলমাল বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। ব্যাপারটি শুরু হল এভাবে, মাওলা সাহেবের দৈনন্দিন বক্তৃতা শুনে শুনে আমাদের ছোট কেরানি আকমল সাহেব একদিন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের মুরীদ হওয়ার অনেক সুবিধে, পীর নাকি তখন পরকালের বড় বড় দায়িত্বগুলো নিয়ে নেন। আকমল সাহেবের জন্যে এটা কল্পনার বাইরে, তিনি এমন নিষ্কর্মা মানুষ যে, পরকাল দূরে থাকুক, ইহকালের কোনো দায়িত্ব তাঁকে দেয়া যায় না। দুষ্টু লোকেরা বলে, আকমল সাহেব নাকি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সিকি-আধুলি পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে নিয়ে নেন। আকমল সাহেব মুরীদ হওয়ার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। অফিসে এখন বেশ জমজমাট একটা ধর্মীয় ভাব। পীরের দরবারের উরশ, ওয়াজ এবং মিলাদ-মাহফিলের খবরাখবর আমরা সকাল-বিকাল পেতে থাকি। পীরের মুরীদেরা তখন বেশ একটা সংঘবদ্ধ দল একসাথে বসে হুজুরে বাবার নামমাহাত্ম্য নিয়ে আহা-উহ করতে থাকেন।

যাঁরা যাঁরা তখনো পীরের মুরীদ হয়ে যান নি, তাঁদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্যে ভক্ত মুরীদেরা নানারকম চেষ্টাচরিত্র করতে থাকেন। আমাদের হেড ক্লার্ককে সে প্রসঙ্গে একদিন একটু অনুরোধ করতেই ঝামেলার সূত্রপাত। ঘটনাটি এরকম : আকমল সাহেব দুপুরে টিফিন খাবার পর হেড ক্লার্ক আজিজ খাঁকে একা একা পেয়ে বললেন, আজিজ সাহেব, এ জীবন আর কয়দিনের?

আজিজ সাহেব বললেন, অনেকদিনের। কম হলে তো বেঁচেই যেতাম।

আকমল সাহেব না শোনার ভান করে বললেন, এখন যদি আল্লাহ্‌র দিকে না যাই তাহলে কখন যাব?

আজিজ সাহেব বললেন, যাচ্ছেন না কেন? কে আপনাকে নিষেধ করছে?

আপনারা যদি আসেন জোর পাই বুকে।

আজিজ সাহেব লাল হয়ে মেঘস্বরে বললেন, কী করতে হবে আমাকে?

যদি শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে যান, আমরা মুরীদ ভাইয়েরা—

আকমল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না, আজিজ খাঁ তার আগেই একেবারে ফেটে পড়লেন, ঐসব কুতুবপুরী সম্বুন্ধীপুরী আমার কাছে আনবেন না। ভণ্ড চালবাজের দল, আপনার কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে আমার হুজুর পা পর্যন্ত মুছবেন না।

কথা শেষ হওয়ার আগেই লিকলিকে শরীর নিয়ে আকমল সাহেব আজিজ খাঁয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড হাতাহাতি শুরু হওয়ার অবস্থা, আমরা টেনে সরিয়ে রাখতে পারি না।

সেই থেকে আকমল সাহেব আর আজিজ খাঁয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু খবর ছড়িয়ে গেল দ্রুত। আজিজ খাঁয়ের মতো লোকেরও নিজের পীর আছে। শুধু তাই নয়, সেই পীর নাকি হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে পা পর্যন্ত মোছেন না। লোকজন খবর নিতে আসে। স্বল্পভাষী আজিজ খাঁ বলবেন না বলবেন না করেও একটা দুটো কথা বলে ফেলেন। শুনে সবার ভিরমি লেগে যায়। একটি গল্প এরকম : আঠার বছরের মেয়েকে নিয়ে মা এসেছেন পীরের কাছে। দুই বছর থেকে সেই মেয়ের ওপর জিনের আছর। মেয়ে পীরকে দেখে আর এগুতে চায় না, কারণ সহজ, মেয়ে তো আসলে মেয়ে নয়, তাকে চালাচ্ছে এক কাফির জিন, জিনদের ভেতরেও নামাজী এবং কাফির জিন আছে। পীর খালি একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর এক হাত সুতা নিয়ে বসলেন। একটা করে সুরা পড়েন আর সুতায় একটা করে গিঁট দেন, সাথে সাথে জিনের সে কী চিৎকার! বলে, বাবাগো, মাগো, ছেড়ে দাও, সুলায়মান পয়গম্বরের কসম আমাকে ছেড়ে দাও। পীর বললেন, শালার ব্যাটা, তুই এখনি দূর হয়ে যা। তখন জিন আর যেতে চায় না, হুজুরের সাথে তখন কী ভয়ংকর ঝগড়া! কিন্তু হুজুরের সাথে পারবে সে সাধ্যি কার আছে? শেষ পর্যন্ত জিন যেতে রাজি হল। হুজুর বললেন, যাওয়ার আগে একটা চিহ্ন দিয়ে যা। জিন জিজ্ঞেস করল, কী চিহ্ন দিয়ে যাব? হুজুর বললেন, দরবারের সামনে আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে দিয়ে যা। মুহূর্তে মেয়ে চোখ খুলে তাকায়, আর ঝড় নেই বৃষ্টি নেই মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। আজিজ খাঁ শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত হলেন না, ঘোষণা করলেন যারা যারা ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে চায় সামনের শুক্রবার তাদের নিয়ে যাবেন, নিজের চোখে সেই আমগাছের ভাঙা ডাল দেখে আসবে।

পরের সপ্তাহে বেশ কয়জন আজিজ খাঁর সাথে পীরের দরবার থেকে ঘুরে এলেন। আজিজ খাঁয়ের গল্পে কোনো মিথ্যা নেই। সত্যি সত্যি দরবারের সামনে আমগাছের ভাঙা ডাল। তখন–তখনি কয়েকজন সেই পীরের মুরীদ হয়ে গেল।

এরপর অফিস দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদেরা এবং হযরত মাওলানা নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদেরা। আমরা কয়েকজন কোনো দলেই নেই এবং আমাদের হল সবচেয়ে বিপদ। দু'দলের ওয়াজ–নসীহত, উরশ এবং মিলাদের চাঁদা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এক দলকে পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে আরেক দল দশ টাকা না নিয়ে ছাড়ে না, তখন আবার প্রথম দল এসে আরো পাঁচ টাকা নিয়ে সমান সমান করে দেয়। চাঁদা না দিয়ে উপায় নেই। এক দুই মিনিট অনুরোধ করেই হুমকি দেয়া শুরু হয়ে যায়। দেখে–শুনে মনে হল সবকিছু ছেড়েছুড়ে নিজেই পীর হয়ে যাই। পীর যদি হতে না পারি, অন্তত ধর্মটা পাল্টে ফেলি। অফিসে এক জন বৌদ্ধ কেরানি আছে, দিলীপকুমার বড়ুয়া, তাকে কেউ কখনো

বিরক্ত করে না।

সেদিন সফদর আলীর সাথে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে পীরের উপদ্রব নিয়ে কথা হচ্ছিল। কী ভাবে দুই পীরের ভক্তেরা দলাদলি শুরু করেছেন এবং দুই দলের টানাটানিতে আমাদের কী ভাবে দম বের হয়ে যাচ্ছে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম।

সব শুনেটুনেও সফদর আলী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, পীরদের কি কোনো পরীক্ষা পাস করতে হয়?

আমি হাসি গোপন করে বললাম, না।

তাহলে আপনি বুঝবেন কেমন করে যে সে পীর?

ব্যাপারটা হচ্ছে বিশ্বাস।

তাহলে আপনি কেন একজনকে বিশ্বাস করবেন, আরেকজনকে অবিশ্বাস করবেন?

আমাকে তখন সফদর আলীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হয়। বিশ্বাস অর্জনের জন্যে সবসময়েই পীরদের সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী ছড়ানো হয়। সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা থাকে, অলৌকিক জিনিস বিশ্বাস করতে তাদের এতটুকু দেরি হয় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অলৌকিক ঘটনাগুলো কখনো কেউ যাচাই করার চেষ্টা করে না। আমি এখন পর্যন্ত একটি মানুষকেও পাই নি যে বলেছে সে নিজে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেছে। সবসময়েই শোনা ঘটনা, ওমুকের বড় ভাইয়ের শালা বলেছেন, ওমুকের ভায়রা ভাই নিজের চোখে দেখেছেন। ওমুক অফিসের বড় সাহেব করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এক জন দু'জন যে নিজের চোখে দেখেছেন বলে দাবি করেন নি তা নয়। কিন্তু চেপে ধরার পর সবসময়েই দেখা গেছে হয় মিথ্যে না হয় অতিরঞ্জন। একবার দুবার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমি পীরদের কাছে গিয়েছি। কিন্তু সময় এবং পয়সা নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় নি।

সফদর আলীর তখনো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না, মাথা চুলকে বললেন, তাহলে এক জন মানুষ কেন পীর হয়ে যায়?

পীরদের বাড়ি দেখেছেন কখনো?

না।

দেখলে আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, পাকা দালান, ফ্রিজ, টেলিভিশন ছাড়া পীর নেই। পীরদের চেহারা দেখলে আপনি বোকা বনে যাবেন, দুধ–ঘি খেয়ে একেকজনের অন্তত আড়াই মণ ওজন এবং গায়ের রঙ গোলাপি। এই বাজারে এত আরামে কয়জন থাকতে পারে? একবার একটা ভালো পীর যদি হয়ে যেতে পারেন, কয়জন বড় পুলিশ, আর্মি অফিসারকে মুরীদ করে নিতে পারেন, আর কোনো চিন্তা নেই।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে খানিকক্ষণ কী একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, তার মানে যত পীর দেখা যায় সবাই আসলে দুষ্টু লোক?

তা নির্ভর করে আপনি দুষ্টু লোক বলতে কী বোঝান তার ওপর। তবে হ্যাঁ, যারা লোক ঠকায় তারা দুষ্টু লোক ছাড়া আবার কী?

সবাই লোক ঠকায়?

আপনি কোনো গরিব পীর দেখেছেন? দেখেন নি—কারণ গরিব পীর নেই। যে-পীরের যত নামডাক সেই পীরের তত বেশি টাকাপয়সা, টাকাপয়সাটা আসে কোথা থেকে? পীরদের কখনো তো চাকরিবাকরি করতে দেখি না।

তার মানে আসলে সত্যিকার কোনো পীর নেই?

নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা কখনো চাইবে না লোকজন তাদের কথা জেনে ফেলুক, কাজেই তাদের দেখা পাওয়া মুশকিল।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকেন।

সৌভাগ্যক্রমে অফিসে পীরসংক্রান্ত উচ্ছ্বাস চরমে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে শুরু করে। সবকিছুরই এরকম নিয়ম, এক জিনিস নিয়ে আর কত দিন থাকা যায়? যারা পীরদের কাছে যায় সবারই কোনো-না-কোনো সমস্যা থাকে, প্রথম প্রথম তাদের প্রবল বিশ্বাস থাকে যে পীর তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। পীর কখনোই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। তীব্র বিশ্বাস নিয়ে তবু মুরীদেরা কিছুদিন ঝুলে থাকে। তারপর একসময় উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে আসে। এবারেও তাই, আমি দেখতে পাই হযরত খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নুরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদদের উচ্ছ্বাস আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাই একদিন ভোরে অফিসে এসে যখন দেখতে পাই যোগ ব্যায়ামের মাহাত্ম্য দেখানোর জন্যে সেকশান অফিসার ইদরিস সাহেব ছোট একটা হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন, আর লিকলিকে আকমল সাহেব তাঁর পেটের ওপর খালি পায়ে লাফাচ্ছেন, আমার বেশ ভালোই লাগল। পীর-ফকিরের ওপর অন্ধবিশ্বাস থেকে কোনো একটা কিছু প্রমাণ করার জন্যে হাতে-কলমে চেষ্টা করা অনেক ভালো।

ধীরে ধীরে অফিসটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল, মোহররমের মাসটা পর্যন্ত চাঁদা না দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু তার মাঝে গোলমাল বেধে গেল, সত্যি কথা বলতে কি বেশ বড় গোলমাল। একদিন ভোরে অফিসে এসে দেখি টাইপিস্ট সুলতান সাহেবের টেবিল ঘিরে একটা ভিড়। ভিড় দেখলে আমি যোগ না দিয়ে পারি না। এবারেও ভিড়ে গেলাম। সুলতান সাহেব এক জন নতুন পীরের খোঁজ এনেছেন। এই পীরের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুলতান সাহেবের বড় ভাই নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই পীর নাকি জিকির করতে-করতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মা তখন উচ্চমার্গে চলে যায় এবং সারা শরীর থেকে চল্লিশ ওয়াট বাল্‌বের মতো আলো বের হতে থাকে। এরকম অবস্থায় তিনি সবরকম ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে চলে যান, তখন তাঁকে আগুনের উপর ফেলে দিলে তিনি টের পান না। চাকু দিয়ে আঘাত করলে চাকু পিছলে যায়। দা দিয়ে কোপ দিলে দা ছিটকে আসে—তাঁর কিছু হয় না। আধঘন্টা তাঁকে আগুনের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছিল। যখন আগুন নিভে গেল, দেখা গেল চোখ বন্ধ করে মুখে হাসি নিয়ে জিকির করছেন।

সুলতান সাহেবের গল্প শেষ হতেই সবাই আমার মুখের দিকে তাকায়। এত দিনে সবাই জেনে গেছে আমি অবিশ্বাসী। ওয়ালী সাহেব বলেন, কিন্তু আপনি যে সবসময় অবিশ্বাস করেন, এখন কী বলবেন?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, ওসব গালগল্পে কান দেবেন না। সুলতান সাহেব যদি নিজের চোখে দেখে আসতেন, তবু একটা কথা ছিল।

সুলতান সাহেব রেগে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, তার মানে আপনি বলতে চান আমার বড় ভাই মিথ্যা কথা বলেছেন?

ঝগড়া লেগে যাবার মতো অবস্থা, আমি তাড়াতাড়ি নিজের টেবিলে ফিরে আসি।

পরদিন ভোরে অফিসে ঢোকার আগেই সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুলতান সাহেব সবার আগে। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এখন কী বলবেন?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

বলছিলেন আমার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেন না, এখন কী বলবেন? কাল আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

আমি সত্যি সত্যি অবাক হলাম, এসব অলৌকিক জিনিস কেউ নিজের চোখে দেখে এসেছে, সেরকম ঘটনা বিরল। জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখেছেন?

সুলতান সাহেব উৎসাহে টগবগ করতে থাকেন, আপনাদের মতো অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করল কি না করল তাতে কী আসে যায়? কিছু আসে যায় না।

আমি বললাম, তবু শুনি।

আমি গিয়েছি সন্ধ্যার পর, হাজার লোক, তার সামনে বসে হুজুর জিকির করছেন। এক ঘন্টা জিকির করলেন, তারপর, হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে—দশজন মিলে ধরে রাখা যায় না। চোখে-মুখে কেমন একটা আলো আলো ভাব। কোনোরকম ব্যথা-বেদনা নেই—কথা বলতে-বলতে সুলতান সাহেবের চোখ-মুখ থেকেই কেমন একটা আলো বের হতে থাকে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, কী ভাবে বুঝলেন, ব্যথা-বেদনা নেই?

সুলতান সাহেবের মুখ আমার প্রতি অবজ্ঞায় বেঁকে যায়। মুখটা বাঁকা রেখেই বললেন, নিজের চোখে দেখুন এবার, ভাইয়ের কথা তো বিশ্বাস করলেন না, ফিরিশতার মতো বড় ভাই আমার। যখন হুজুর বেহুঁশ হয়ে গেলেন তখন একটা বড় চৌকি আনা হল। চৌকির ওপরে কী জানেন?

কি?

পেরেক। ছয় ইঞ্চি পেরেক। খাড়া হয়ে আছে—একটা নয়, দুইটা নয়, শত শত পেরেক, দেখলে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়। হুজুরের সাগরেদরা হুজুরকে তুলে এনে সেই পেরেকের উপর ফেলে দিলে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মনে হল চোখ খুললে দেখব শরীরটা মোরব্বার মতো গেঁথে গেছে পেরেকে। রক্তারক্তি ব্যাপার। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুলেছি, কী দেখলাম জানেন?

সবাই এর মাঝে কয়েকবার গল্পটা শুনেছে, তবু উৎসাহের অভাব নেই, কয়েকজন একসাথে জিজ্ঞেস করলেন, কি?

দেখলাম হুজুর খাড়া পেরেকের উপর ভেসে আছেন, চোখ বন্ধ। কিন্তু মুখে হাসি। পেরেকের বিছানা না, যেন গদির বিছানা।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

সুলতান সাহেব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলেন, কী বলছি এতক্ষণ? নিজের চোখে দুই হাত দূরে বসে দেখেছি। দুই হাতের এক ইঞ্চি বেশি নয়।

আজিজ খাঁ বললেন গল্পটা শেষ করেন, আসল ব্যাপারটাই তো এখনো বললেন

না।

সুলতান সাহেব মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে এলেন, অবিশ্বাসী মানুষকে বলে লাভ কি? যার বিশ্বাস হবে না, খোদা তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও বিশ্বাস হবে না।

তবু বলেন।

সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকালেন, শুনতে চান?

বলেন, শুনি।

শোনেন তাহলে। যখন দেখলাম হুজুর সেই পেরেকের বিছানায় শুয়ে আছেন, আমার তখন হুজুরের ক্ষমতার উপরে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মতো একজন দু'জন মানুষ কি আর নেই? তাদের ভেতরে তো সন্দেহ থাকে। তাদের সন্দেহ মেটানোর জন্যে এক জন সাগরেদ একটা বড় তক্তা নিয়ে এসে হুজুরের বুকের উপর রাখলেন। তক্তার উপরে রাখলেন দুইটা থান ইট, দেখে ভয়ে তো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! ঘটনাটা মনে করে সুলতান সাহেব সত্যি দম বন্ধ করে ফেললেন।

বলুন, বলুন, অন্যেরা সুলতান সাহেবকে থামতে দেন না।

হুজুরের বুকের উপর ইট রেখে সাগরেদ নিয়ে এল একটা মস্ত হাতুড়ি। কিছু বোঝার আগে হাতুড়ি তুলে দিল হুজুরের বুকে প্রচণ্ড এক ঘা। ইট দুইটা ভেঙে টুকরা–টুকরা, হুজুর কিছু জানেন না, চোখ বন্ধ করে জিকির করে যাচ্ছেন।

সমবেত শ্রোতাদের বুকের ভেতর থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আপনি কী বলতে চান?

মাথা চুলকে বললাম, নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত—

তার মানে আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা কথা বলছি?

না না, তা বলছি না। যেহেতু আপনার এত বিশ্বাস, হয়তো অনেক খুঁটিনাটি জিনিস আপনার চোখে পড়ে নি, নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারব।

মাওলা সাহেব বললেন, তার মানে আপনি বলছেন এটা বুজরুকি?

নিজে না দেখে কিছু বলব না। অবিশ্বাস্য জিনিস দেখলেই সেটা বিশ্বাস করা ঠিক না। ম্যাজিশিয়ানরা মানুষ কেটে জোড়া লাগিয়ে ফেলে। তার মানে কি ম্যাজিশিয়ানরা পীর?

অফিসের সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যে, তাদের ভেতর যদি বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকত, আমি ভস্ম হয়ে যেতাম।

পরের কয়দিন আমি নিয়মিত সেই পীরের আস্তানায় যাওয়া শুরু করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সুলতান সাহেব এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি সত্যি সেই পীর সুচালো পেরেকের উপরে শুয়ে থাকেন। সাগরেদরা বুকে থান ইট ভেঙে টুকরা–টুকরা করে ফেলেন, পীরের কোনোরকম অসুবিধে হয় না। শুধু তাই নয়, একদিন দেখি বড় বড় কাঠের টুকরা পুড়িয়ে গনগনে আগুন করা হল, সাগরেদরা কোনোভাবে সেই পীরকে আগুনের উপর দাঁড় করিয়ে দিল, পীর খালিপায়ে ঐ আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। অনেকের সাথে সাথে আমিও পীরের পায়ের তলা দেখে এসেছি, ফোস্কা দূরে থাকুক, একটু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখে শুনে

আমিও হতবাক হয়ে যাই, বিশ্বাসও প্রায় করে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ অংশটুকু এখনো কোথায় জানি সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছে। প্রতি রাতের একই ব্যাপার। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে পীর আধা বেহুঁশ হয়ে একটা গদিতে পড়ে থাকেন, তখন ভক্তেরা একে একে আসতে থাকে, পীর বাবার পা ধরে নিজেদের দুঃখ–কষ্ট–সমস্যার কথা বলে যায়। পীর বাবা কাউকে একটা লাথি দেন, কাউকে একটু চাল পড়া দেন, কাউকে এক টুকরো কয়লা, আবার কারো জন্যে একটু দোয়া করে দেন। ভক্তেরা হুজুরের পায়ের কাছে বড় গামলাতে সামর্থ্যমতো টাকাপয়সা ফেলে যায়। হুজুর এবং তাঁর সাগরেদরা আড়চোখে দেখেন কে কত টাকা দিল। টাকার অঙ্ক বেশি হলেই তাদের মুখের হাসিটি বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভক্তের খাতির–যত্নও হয় বেশি, পীর বাবা লাথি না দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন! দেখতে–দেখতে গামলা ভরে ওঠে টাকায়। প্রতি রাতে অন্তত হাজারখানেক টাকা কিংবা আরো বেশি। এইখানেই আমার সন্দেহ, ঐশ্বরিক ব্যাপারের সাথে সাথে টাকাপয়সার ব্যাপারটি ঠিক খাপ খায় না—সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষের টাকাপয়সার কী দরকার?

অফিসে যারা হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী এবং হযরত নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদ ছিলেন, তাঁরা সবাই এখন এই নতুন পীর হামলা বাবা বিক্রমপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। সুলতান সাহেবের দীর্ঘদিন থেকে অম্বলের ভাব, সেদিন পীর সাহেবের চাল–পড়া খাবার পর থেকে নাকি চোঁকা ঢেকুরের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে গেছে। মাওলা সাহেবের পিঠে ব্যথা, সেদিন হামলাবাবার একটা লাথি খাওয়ার পর থেকে ব্যথার কোনো চিহ্ন নেই। আজিজ খাঁয়ের ছোট ছেলের হুপিং কাশ, বাবার তেল–পড়া বুকে মাখিয়ে দেয়ার পর থেকে কাশির কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিদিনই এরকম নতুন নতুন ঘটনা শুনতে থাকি। এবারে আর শোনা ঘটনা নয়, সব চাক্ষুষ ঘটনা। অফিসের বিশ্বাসী লোকজনের খোঁচায় আমার অফিসে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবস্থাচক্রে মনে হয় আর কয়দিন দেখে–শুনে আমিও হয়তো হামলা বাবার পা চেপে ধরে মুরীদ হয়ে যাব।

চায়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমি সে কথাটাই বলছিলাম। অলৌকিক কিছু হতে পারে না, আজীবন বিশ্বাস করে এসেছি, এখন হঠাৎ চোখের সামনে এরকম অবিশ্বাস্য জিনিস দেখে মানুষের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করি কেমন করে? হয়তো সুলতান সাহেবের কথাই ঠিক, মানুষ হয়তো দীর্ঘদিন তপস্যা করে সত্যি সত্যি অলৌকিক শক্তি অর্জন করে ফেলে।

আমি সফদর আলীকে সবকিছু খুলে বললাম, শুনে তিনি খুব অবাক হলেন বলে মনে হল না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, যে চৌকিতে তাকে শোওয়ানো হয় সেখানে পেরেকের সংখ্যা কত?

অনেক, গুনে তো দেখি নি!

তবু, আন্দাজ?

এক আঙুল পরপর হবে, পাঁচ ছয় শ' কী এক হাজার!

সফদর আলী মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কী একটা হিসেব করলেন। তারপর মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, পীর সাহেবের বুকের উপর যে–ইটটাকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়, সেটা ভেঙে যায় তো?

হ্যাঁ।

কয় টুকরা হয়?

অনেক, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

সফদর আলী আরো কিছুক্ষণ কী একটা হিসেব করে বললেন, যখন গনগনে কয়লার উপর দিয়ে হাঁটে, তখন কি আস্তে আস্তে হাঁটে না তাড়াতাড়ি?

তাড়াতাড়ি, বেশ তাড়াতাড়ি।

হাঁটার আগে কি পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়?

আমি মাথা চুলকে মনে করার চেষ্টা করি। পা ভিজিয়ে নেয়ার কথা মনে নেই, কিন্তু মনে হল সাগরেদরা তাকে ওজু করিয়ে দেয়। শুনে সফদর আলী একটু হাসলেন, পকেট থেকে কী একটা ছোট বই বের করে সেখান থেকে কী সব টুকে নিয়ে কী একটা হিসেব করে হঠাৎ খিকখিক করে হাসতে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

ব্যাটা এক নম্বর চোর।

কে?

আপনার পীর বাবা।

কেন?

এই দেখেন। সফদর আলী তাঁর নোটবইটা দেখালেন, সেখানে অনেকরকম হিসেব, নিচে এক জায়গায় লেখা, (২০০ + ১০০০) × ২ = চোর (৬০০ + ১০,০০০) + ১০০ =মহাচোর।

আমি খানিকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এরকম অঙ্ক কষে চোর মহাচোর বের করতে দেখা এই প্রথম। সফদর আলীর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, বুঝতে পারলেন না? ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিই।

সফদর আলীর বেশ কিছুক্ষণ লাগল আমাকে বোঝাতে। মাথাটা বরাবরই আমার একটু মোটা। এসব জিনিস বুঝতে আমার একটু সময় লাগে। কিন্তু এক বার বুঝিয়ে দেয়ার পর আমারও কোনো সন্দেহ থাকে না যে, পীর বাবা আসলে একটা চোর ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটি এরকম, এক জন মানুষের ওজন খুব বেশি হলে হয়তো দেড় শ' পাউন্ড হয়, আমাদের পীর বাবার কথা অবশ্যি আলাদা। ঘি–মাখন খেয়ে দু' শ' পাউন্ডের এক ছটাক কম নয়। তিনি যখন সূচালো পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে থাকেন, তখন এই পুরো ওজনটি প্রায় হাজার খানেক পেরেকের উপর ভাগ হয়ে যায়। পুরো ওজনটি যদি একটি মাত্র পেরেকের ওপর দেয়া হত, পেরেকটি সাথে সাথে শরীর ফুটো করে ঢুকে যেত, কিন্তু সেটি কখনো করা হয় না। হাজারখানেক সূচালো পেরেককে দেখতে ভয় লাগে ঠিকই, কিন্তু একেকটি পেরেকে মাত্র কয়েক আউন্স করে চাপ পড়ে। সেটি কিছুই নয়। যে কোনো মানুষ একটি পেরেকের মাথায় কয়েক আউন্সের চাপ সহ্য করতে পারে, এমনকি ঘি–দুধ–খাওয়া পীরসাহেব পর্যন্ত! বুকের উপর থান ইট ভেঙে ফেলা ব্যাপারটি শুধু দেখতেই ভয়ংকর, আসলে কিছু না, হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে যেটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তার বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় ইটটাকে ভাঙতে। বাকিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পেরেকের উপরে চাপ আরো আউন্সখানেক বাড়িয়ে দেয়, সেটা এমন কিছু নয়। গনগনে কয়লার উপরে হাঁটা

ব্যাপারটা একটু জটিল, একটু বিপজ্জনকও। জ্বলন্ত কয়লার তাপমাত্রা ছয় সাত শ' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে জিনিসটা কয়লা। কয়লার ওজন কম। কাজেই এর তাপ ধারণ করার ক্ষমতাও কম। কাজেই কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপরে চাপ দেয়, খুব বেশি তাপ পায়ে এসে পৌঁছাতে পারে না। কয়লা পা-কে পোড়ানোর আগেই পা কয়লাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কয়লার ভিতরের তাপ পা পর্যন্ত পৌঁছুতে একটু সময় লাগে, কিন্তু খুব দ্রুত হেঁটে গিয়ে সেই সময়টুকুও কয়লাকে দেয়া হয় না। তা ছাড়া যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া। তাই যখন জ্বলন্ত কয়লায় পা দেয়া হয়, পায়ের তলার পানি বাষ্পীভূত হয়ে পায়ের তলায় বাষ্পের একটা খুব সূক্ষ্ম আস্তরণ তৈরি করে ফেলে। বাষ্পের আস্তরণ, সেটা যত সূক্ষ্মই হোক, তার ভিতর দিয়ে তাপ খুব ভালোভাবে যেতে পারে না। সফদর আলী ব্যাপারটাকে হাতে-কলমে দেখালেন। চায়ের দোকানের দোকানি তখন সিঙাড়া ভাজার জন্যে কড়াইটা গরম করছিল, বেশ গনগনে গরম কড়াই, সফদর আলী তার উপর কয়েক ফোঁটা পানি ফেলে দিলেন। সেগুলো সাথে সাথে বাষ্পীভূত না হয়ে খানিকক্ষণ কড়াইয়ের উপর দৌড়ে বেড়াল। পানির ফোঁটার নিচে বাষ্প, তাপ সেই বাষ্পের আস্তরণ ভেদ করে পানিতে পৌঁছাতে পারছে না বলে পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে না। ভারি মজার ব্যাপার।

সফদর আলীর ব্যাখ্যা শুনে আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করে, সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছি পৃথিবীতে অলৌকিক বা ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। সেই বিশ্বাস ছেড়ে দিতে হলে খুব দুঃখের ব্যাপার হত। আমার আনন্দের বড় কারণটা অবশ্যি অন্য একটি ব্যাপার। সফদর আলীর এরকম বিজ্ঞানী মাথা, তিনি যখন এত সহজে ব্যাপারটি ধরে ফেলতে পারলেন, আরো সহজে হয়তো এমন একটা বুদ্ধি বের করতে পারবেন যে জোচ্চোর পীরকে হাতেনাতে ধরে ফেলা যাবে।

সফদর আলীকে সে কথাটি বলতেই তিনি প্রায় আঁৎকে উঠলেন। বললেন, না না না, সে কী করে হয়?

কেন?

বয়স্ক একটা মানুষকে এভাবে লজ্জা দেয়া ঠিক না।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ব্যাটা জোচ্চোর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দশজন নিরীহ মানুষের মাথা ভেঙে খাচ্ছে, সেটা দোষ নয়, আর তাকে ধরিয়ে দেয়া দোষ?

সফদর আলী প্রবল বেগে মাথা নাড়েন, তাই বলে বয়স্ক এক জন মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবেন? সে কী করে হয়?

আমার অনেকক্ষণ লাগল সফদর আলীকে বোঝাতে যে, ব্যাপারটিতে কোনোরকম দোষ নেই, যদি তাকে ধরিয়ে না দেয়া হয় সে সারা জীবন সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাবে। প্রায় আধা ঘন্টা বোঝানোর পর তিনি রাজি হলেন। কী করে তার জোচ্চুরি ধরা হবে চিন্তা করে বের করতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগল না। ব্যাপারটি এত সহজ যে আমি প্রথম বার শুনেই বুঝে ফেললাম। জোচ্চোর পীরের কী দুর্গতি হবে চিন্তা করে সফদর আলী আর হাসি থামাতে পারেন না। তিনি পারলে তখন-তখনি পীরের আস্তানায় রওনা দিয়ে দেন। আমি অনেক কষ্টে তাঁকে থামিয়ে রাখলাম, জোচ্চোরকে ধরার আগে একটু প্রস্তুতি দরকার।

পরের দুদিন আমার প্রস্তুতি নিতেই কেটে গেল। প্রথম প্রস্তুতি পীর বাবার আস্তানায়। পীরের বড় সাগরেদের সাথে একটু কথাবার্তা বলতে হবে। গত কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছে আমি একেবারে সামনে এসে বসে আছি, কিন্তু কখনোই একটা পয়সাও পীর বাবার গামলাতে ফেলছি না। আজ আমাকে দেখেই তাই ভুরু কুঁচকে ফেলল, আমি আড়ালে ডেকে নিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম। বললাম, আমি এক জন আলু ব্যবসায়ীর ম্যানেজার। আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর আলু ছাড়াও অন্য অনেকরকম ব্যবসা আছে, যেটা আমি চোখ টিপে জানিয়ে দিলাম যে কারো সাথে আলোচনা করতে চাই না। বললাম, ব্যবসায়ীর বিস্তর টাকা, ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা, আবার পীর-ফকিরে বিশ্বাস। ভালো পীর পেলে মুরীদ হয়ে পীর বাবার পায়ে লাখ-দু' লাখ টাকা দিয়ে দিতে চান, তাতে ধর্মেরও কাজ হয়, আবার ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলাটাও মেটে।

একটু শুনেই সাগরেদের চোখ চকচক করতে থাকে, আমাকে চেপে একটা চেয়ারে বসিয়ে এক জনকে চা আনতে পাঠিয়ে দেয়। আমি স্বরযন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বললাম, আমার ব্যবসায়ী কালু খাঁর একটামাত্র ভয়, একটা ভণ্ড পীরের পিছনে না টাকাটা নষ্ট হয়! আমি তাই অনেক দিন থেকে ভালো পীর খুঁজে বেড়াচ্ছি। যতগুলো দেখেছি সবগুলো ভণ্ড, এই প্রথম একটা খাঁটি পীর পেয়েছি—

সাগরেদ আমাকে থামিয়ে দিয়ে পীর বাবার প্রশস্তি শুরু করে, তিনি কোন পীরের আপন ভায়রা ভাই, কোন পীরের বড় শালা এবং কোন কোন পীরের সাক্ষাৎ জামাতা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, পেরেকে শোওয়া এবং আগুনের উপর হাঁটা ছাড়াও তিনি আর কী কী করতে পারেন, খুলে বলতে শুরু করে। তাঁর চোখ নাকি এক্সরের মতো এবং তিনি কাপড় ভেদ করে দেখতে পারেন। তিনি জিন বন্দি করার দোওয়া জানেন এবং তাঁর শোওয়ার ঘরে ছয়টা হোমিওপ্যাথিকের শিশিতে নাকি ছয়টা জিন বন্দি করা আছে।

আমাকে ধৈর্য ধরে পুরো বক্তৃতাটা শুনতে হল, বক্তৃতা শেষ হলে তার সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে আমি বললাম, পীর বাবার উপরে আমার বিশ্বাস ষোল আনার উপরে আঠার আনা, কালু খাঁ যদি শুধু একবার এসে দেখেন, সাথে সাথে মুরীদ হয়ে যাবেন। তবে—

তবে কি?

ব্যবসায়ী মানুষ, মনে সন্দেহ বেশি। কাজেই শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে কাজ কী, যেদিন কালু খাঁ আসবেন, হুজুরকে একবার পেরেকের উপর শুইয়ে তারপর আগুনের উপর হাঁটিয়ে দেবেন, কালু খাঁ সাথে সাথে কাত হয়ে যাবেন।

সাগরেদ বললেন, এক শ' বার এক শ' বার। হুজুরের রুহের উপর কষ্ট হয়, তাই যেদিন হুজুর পেরেকের বিছানায় শুয়ে থাকেন সেদিন আগুনের উপরে হাঁটতে দিই না। তবে কালু খাঁ সাহেব যখন একটা ভালো নিয়ত করেছেন, না হয় হুজুরের রুহ একটু কষ্ট করলই।

আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি উঠে পড়ি। সাগরেদ অনেক ঘোড়েল ব্যক্তি, আমাকে জানিয়ে দিলেন কালু খাঁ সত্যি যদি লাখ দু' লাখ টাকা দিয়ে দেন,

আমাকে একটা পার্সেন্ট ধরে দেবে। শুধু তাই না, হুজুরের মুরীদ পুলিশের বড় অফিসার আছে, কালু খাঁর যদি প্রয়োজন হয় হুজুর বলে দেবেন, আইনের ভেতরের–বাইরের জিনিস নাকি তাহলে নাড়াচাড়া করে দেবে! শুনে আমি থ হয়ে যাই।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তুতিটি নেয়ার জন্যে খবরের কাগজের অফিসে যেতে হল। আমার এক পুরানো বন্ধু সেখানে সাংবাদিকতা করে, তবে মুশকিল হচ্ছে, তার কখনো দেখা পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে মাঝরাতে তাকে ধরা গেল। আমাকে দেখে বলল, কী হল, আমাকে নাকি গরু–খোঁজা করছিস?

গরুকে গরু–খোঁজা করব না তো ছাগল–খোঁজা করব?

কি ব্যাপার?

তোর সাথে জরুরি দরকার।

কী কপাল আমার!

বুধবার সন্ধেবেলাটা আমার জন্যে রাখতে হবে।

কী জন্যে, ভাগ্নের জন্মদিন?

না না, ওসব নয়, এক পীরের আস্তানায় যেতে হবে।

বন্ধু মাথা চুলকে বলল, কিন্তু বুধবার যে আমার এক ফিল্ম স্টারের সাথে সাক্ষাৎকার!

সেসব আমি জানি না, বুধবার অবশ্যি অবশ্যি তোকে আসতে হবে, তোর ক্যামেরা, ফ্লাশ সবকিছু নিয়ে।

কোথায়?

পীর বাবার আস্তানায়, তোকে ঠিকানা দিয়ে দেব।

সাংবাদিক বন্ধু চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! তুই কবে থেকে আবার পীরের ভক্ত হলি?

আমি বললাম, সে তুই গেলেই দেখবি।

সাংবাদিক বন্ধু বলল, ঠিক আছে, আমি যেতে পারি, কিন্তু কোনো পীরের পাবলিসিটি করে আমি কিছু লিখতে পারব না।

সে তোর ইচ্ছে। আর শোন্, ওখানে গেলে খবরদার আমাকে দেখে চেনার ভান করিস না।

কেন?

কারণ ওখানে আমি আমি না, আমি হচ্ছি আলু ব্যাপারি কালু খাঁর ম্যানেজার।

বন্ধুটি কিছু না বুঝে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, আমি সে অবস্থাতেই বিদায় নিয়ে চলে আসি।

আমার দু'নম্বর কাজটি শেষ। তিন নম্বর কাজটি একটু কঠিন। পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটার রহস্যটা একটা কাগজে লিখে ফেলা। লেখালেখি ভালো আসে না আমার, বিস্তর সময় লেগে গেল। শুধু লিখেই শেষ নয়, সেটা আবার ফটোকপি করে শ'খানেক কপি করে ফেলতে হল, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেই!

শেষ কাজটি কঠিন নয়, কিন্তু বিপজ্জনক। পীর বাবার বুজরুকি ধরার জন্যে কিছু

ছোটখাট ব্যবস্থা করা, তার আস্তানায় সেদিনই করতে হবে, আগে থেকে করে রাখার উপায় নেই। সফদর আলী অবশ্যি ভরসা দিয়েছেন তিনি ঠিক ঠিক করে নেবেন, ধরা পড়ে ভক্তদের হাতে মার খাওয়ার একটা আশঙ্কা আছে, কিন্তু মহৎ কাজে বিপদের ঝুঁকি না নিলে কোন মহৎ কাজটা করা যায়?

বুধবার সন্ধেবেলা আমি সময়মতো পীর বাবার দরবারে এসে হাজির হলাম। আসার সময় নিউ মার্কেটের সামনে থেকে একটা চালু গোছের বাচ্চাকে ধরে এনেছি, নাম নান্টু। তার সাথে কুড়ি টাকার চুক্তি, দশ টাকা অগ্রিম, বাকি টাকা কাজ শেষ হলে দেয়া হবে। কাজটি কঠিন নয়, পীর বাবার দরবারে যখন হৈচৈ লেগে যাবে, লোকজন চেঁচামেচি করতে থাকবে তখন ভেতরে ঢুকে "পীর বাবার জোচ্চুরি" "পীর বাবার জোচ্চুরি" বলে ফটোকপি করা কাগজগুলো বিলি করতে হবে। শুনে ছেলেটা মহাখুশি, হাতে কিল মেরে বলল, 'নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল!'

কথাটার মানে কি এবং কাগজ বিলি করার সাথে এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্যি বোঝার বেশি চেষ্টাও করি নি, ছোট বাচ্চাদের যদি বুঝতেই পারব, তাহলে ওরা আর বাচ্চা কেন?

পীর বাবার দরবারে ঢুকতেই বড় সাগরেদ একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, খাঁ সাহেব এসেছেন?

আমি ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ওখানে বসে আছেন, এখন পরিচয় দিতে চান না। ভিড়টা কমে গেলে হুজুরের কাছে নিয়ে যাব।

সাগরেদের একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে আমার সাথে দীন, দুনিয়া এবং আখেরাত নিয়ে কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বলতে আমি দরজার দিকে লক্ষ করছিলাম। সফদর সাহেবের আলাদাভাবে আসার কথা, তিনি এসে গেছেন। দরবারের কাছাকাছি পেরেকের চৌকিটা সাজানো আছে, একজন দু'জন সাহসী দর্শক কাছে এসে জিনিসটা ছুঁয়ে দেখছিল, লক্ষ করলাম সফদর আলীও দর্শকদের সাথে এসে চৌকিটার পেরেকগুলো টিপেটুপে দেখার অভিনয় করছেন, অত্যন্ত কাঁচা অভিনয়। ভালো করে লক্ষ করলে যে কেউ বুঝে ফেলবে। আমি বড় সাগরেদকে একটু ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তার দরকার ছিল না, কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আগুনের কুণ্ডটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর অর্থ পেরেকের চৌকিতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। সফদর আলী আগুনের কুণ্ডর পাশে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনকভাবে এদিকে-সেদিকে তাকাতে থাকেন, আমি শঙ্কিতভাবে দেখি এক জন সাগরেদ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সাগরেদ সফদর আলীকে কী একটা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সফদর আলীও কী একটা বললেন। তারপর দু'জনে বেশ সহজভাবেই কথা বলতে থাকেন। সাগরেদ একটা লাঠি দিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জ্বালাতে থাকে। সফদর আলীও তাকে সাহায্য করতে থাকেন। আমি ভয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকি, সাগরেদের এত কাছে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কাজটা শেষ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যান, তাঁর কী অবস্থা হবে, আমি চিন্তা করতে পারি না। খানিকক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি ফিরে যাচ্ছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই তিনি মুচকি হেসে

একটু মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারলাম কাজ শেষ, আমার বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে পীর বাবা এসে দরবারে হাজির হন। চার ফুট লম্বা লাশ, দৈর্ঘ্যে–প্রস্থে প্রায় সমান সমান। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। গাল দুটিতে একটা গোলাপি আভা। মাথায় একটা জমকালো জরিদার পাগড়ি। পরনে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি। সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পীর বাবা মুখে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এসে মখমলের গালিচাতে বসলেন। সাথে সাথে উপস্থিত জনতার মাঝে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—কে কার আগে এসে হুজুরের পা ধরে সালাম করতে পারবে। যাদের বাড়াবাড়ি একটু বেশি, তারা এসে হুজুরের পায়ের তলায় চুমো খাবার চেষ্টা করতে থাকে। হুজুর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ভক্তদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

একটু পরেই বড় সাগরেদ ঘোষণা করলেন যে, এখন হুজুর জিকির শুরু করবেন যাদের অজু আছে তারা হুজুরের সাথে জিকির শুরু করতে পারে।

হুজুরের সামনে মস্ত বড় কাঁচের গামলায় ঠাণ্ডা শরবত রাখা আছে, হুজুর সেখান থেকে একগ্লাস শরবত তুলে এক ঢোক খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সুরেলা স্বরে জিকির শুরু করেন। মাহফিলের শ'তিনেক লোক তাঁর সাথে তাল রেখে গলা ফাটিয়ে জিকির শুরু করে, শব্দে মনে হয় ঘরের ছাদ ফেটে বেরিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে জিকিরের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে, হুজুরের শরীর কাঁপতে থাকে, চোখ ঘুরতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ দড়াম করে মখমলের গদিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। বড় সাগরেদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা মুহূর্তে চুপ করে যায়। হুজুর তখনো গদিতে গোঁ–গোঁ শব্দ করে কাঁপছেন, কয়েকজন সাগরেদ ছুটে এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে পাখা দিয়ে খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তিনি একটু শান্ত হন। বড় সাগরেদ গলা নামিয়ে বললেন, খবরদার, কেউ এখন জোরে শব্দ করবেন না, হুজুরের রুহ এখন অনেক উপরে চলে গেছে, তাঁর শরীরের সাথে এখন তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। এখন হঠাৎ করে কেউ যদি হুজুরকে চমকে দেন তাঁর রুহ আর তাঁর শরীরে ফিরে নাও আসতে পারে। আপনারা একটুও শব্দ করবেন না, সবাই মনে মনে আল্লাহ্কে ডাকেন।

লোকজন শঙ্কিত পাংশু মুখে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে।

বড় সাগরেদ বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে আবার শুরু করেন, হুজুরের শরীরে এখন ব্যথা–বেদনা নেই। কী ভাবে থাকবে, শরীরে যদি রুহ না থাকে সেখানে ব্যথা–বেদনা কোথেকে আসবে? আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে এক্ষুনি দেখবেন, হুজুরের শরীরকে খাড়া পেরেকের উপর রেখে দেব, হুজুর তার উপর যেন ভেসে থাকবেন।

হুজুরের ইয়া লাশ, ঘি–দুধ খেয়ে মোটা খোদার ইচ্ছায় একটু বেশিই হয়ে গেছেন, চর্বির জন্যে তাঁকে ভালো করে ধরা যায় না, পিছলে যেতে চান। তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে দশ বার জন মুশকো জোয়ানের কালঘাম ছুটে গেল। হুজুরকে কোনোমতে টেনে এনে সেই পেরেকের বিছানাতে শোওয়ানোমাত্র একটা মজার জিনিস ঘটে গেল, হুজুর হঠাৎ "বাবা গো" বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করেন। লোকজনের ভেতর একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন শুরু হয়ে হঠাৎ থেমে যায়। সাগরেদরা হতভম্ব। বড় সাগরেদ সবচেয়ে আগে সম্বিত ফিরে পান, ভয়ের ভঙ্গিতে বললেন, নাউজুবিল্লাহ্

নাউজুবিল্লাহ্ নাউজুবিল্লাহ্—আপনারা দরুদ শরিফ পড়েন, সবাই জোরে জোরে দরুদ শরিফ পড়েন, জোরে জোরে।

দরুদ শরিফের আওয়াজে আর কিছু শোনা যায় না, পীর সাহেবের কাতোরক্তি চাপা পড়ে গেল। পীর বাবা লাফিয়ে উঠে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে ঠেসে ধরে রাখল, তার মাঝে এক জন জোর করে বুকের মাঝে একটা তক্তা বিছিয়ে দিয়ে দুটো থান ইট এনে রেখে দেয়। আমি দেখতে পেলাম আতঙ্কে পীর বাবার চোখ গোল-গোল হয়ে উঠেছে, কী একটা বলে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ছাড়া পাবার জন্যে, কিন্তু সাগরেদরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়ছে না। কালু খাঁয়ের লাখ টাকার লোভ খুব সহজ ব্যাপার নয়। গুণ্ডা গোছের এক জন লোক প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি নিয়ে হাজির হয়। পীরবাবার প্রচণ্ড চিৎকার অগ্রাহ্য করে সেই হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাতে সে থান ইট দুটি গুঁড়ো করে ফেলে। সাথে সাথে পীর বাবা এক গগনবিদারী চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠেন, দশ জন সাগরেদ তখন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না, তিনি বাবা গো, মা গো, মেরে ফেলল গো বলে চিৎকার করে লাফাতে থাকেন। দর্শকরা হতচকিত হয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়। সাগরেদরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে রীতিমতো কুস্তির ভঙ্গিতে গদিতে আছড়ে ফেলল, বড় সাগরেদ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কী একটা বলতে থাকেন আর পীর সাহেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি করতে থাকেন। কয়জন সাগরেদ ছুটে গিয়ে ব্যান্ডেজ মলম এনে তাঁকে উল্টে ফেলে পিঠে একটা ব্যান্ডেজ করে দিল—সিল্কের সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছিল, তাঁকে চেপে শুইয়ে রেখেই পাঞ্জাবি বদলে দেয়া হল।

উপস্থিত দর্শক তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কথাবার্তায় আসর রীতিমতো সরগরম। হঠাৎ দেখি নান্টু তার কাগজের বান্ডিল নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকে নিচু গলায় বললাম, এক্ষুনি নয়, আরেকটু পর।

খুশিতে নান্টুর দাঁত বেরিয়ে ছিল, সেগুলো লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বলল, আরো মজা আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

নান্টু হাতে কিল মেরে বলল, নদী মে খাল, মিরচা মে ঝাল।

শেষ পর্যন্ত বড় সাগরেদ উঠে দাঁড়ালেন, কেশে গলা পরিষ্কার করতেই উপস্থিত জনতা একেবারে চুপ করে যায়। বড় সাগরেদ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি এক শ' বার বললাম যার অজু নাই সে যেন জিকিরে যোগ না দেন, কিন্তু আপনাদের মাঝে এক জন আমার কথা শুনেন নাই, অজু ছাড়া জিকিরে টান দিয়েছেন।

উপস্থিত জনতা পাংশু মুখে বসে থাকে। বড় সাগরেদ চিৎকার করে বললেন, হুজুরের জানের জন্যে যার মায়া নাই, জাহান্নামে তার জায়গা নাই। খবরদার বে-অজু মানুষ জিকিরে সামিল হবেন না।

পীর বাবা আবার জিকির শুরু করেন, এবারে তাঁর সাথে যোগ দিল অল্প কিছু লোক, অজু সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এরকম লোকের সংখ্যা বেশি নয়। পীর বাবার সমাধিস্থ হতে বেশি সময় লাগল না। লাখ টাকার লোভ খুব সহজ জিনিস নয়। বড় সাগরেদ আবার উঠে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, হুজুরের রুহ্ এখন সাত আসমান সাত জমিন পার হয়ে উঠে গেছেন, হুজুরের শরীরে এখন

ব্যথা-বেদনা নাই। খবরদার, আপনারা কেউ শব্দ করবেন না, রুহ্ তাহলে শরীরে ফিরে আসতে চায়। তখন রুহের কষ্ট হয়, শরীরে আজাব হতে পারে। খোদার রহমত মানুষের শরীরে নাজেল হলে মানুষের শরীর ফিরিশতার শরীর হয়ে যায়। আপনারা এখন তার প্রমাণ দেখবেন।

আগুনের বড় কুণ্ডতে অনেকক্ষণ থেকে বেশ কয়টা কাঠের গুঁড়ি দাউদাউ করে জ্বলছিল, এবারে সাগরেদরা এসে গনগনে কয়লাগুলি সমানসমান করে বিছিয়ে দিতে থাকে। প্রায় দশ ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া জ্বলন্ত কয়লার একটা রাস্তা তৈরি হয়, পীর বাবা সেটার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন। আধো অন্ধকারে জ্বলন্ত কয়লার লাল আভা দেখে ভয় ভয় করতে থাকে, এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী অবশ্যি বুঝিয়ে দিয়েছেন পা ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে ব্যাপারটি তেমন কঠিন নয়। আজ অবশ্যি অন্য ব্যাপার, সফদর আলী ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সব ভণ্ডামি আজ ধরা পড়ে যাবে। পেরেকের বিছানাটি এত চমৎকার কাজ করেছে যে এবারেও সফদর আলীর ব্যবস্থাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই!

পীর বাবা অনেকক্ষণ থেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, সবাই মিলে তাঁর পা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে ধরাধরি করে জ্বলন্ত কয়লার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। পীর বাবা টলতে টলতে দুলতে দুলতে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিছন থেকে বড় সাগরেদ একটা ধাক্কা দিতেই তিনি এক পা কয়লার উপরে দিলেন। মুহূর্তে তাঁর ভাবগম্ভীর মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি এক লাফে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু বড় সাগরেদ আবার তাঁকে ধাক্কা মেরে জ্বলন্ত কয়লার দিকে ঠেলে দিলেন। পীর বাবা নাক-মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে দুই পা সামনে এগিয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে বাবা গো, মা গো, মেরে ফেললে গো বলে লাফাতে লাফাতে জ্বলন্ত কয়লা থেকে বেরিয়ে এলেন। তার বিরাট থলথলে শরীর নিয়ে তিনি বারকতক ঘুরপাক খেয়ে বড় গামলা ভর্তি শরবতে নিজের পা ডুবিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। এর মাঝে কয়েক বার ফ্লাশের আলো জ্বলে উঠল। আমার সাংবাদিক বন্ধু নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিয়েছে।

উপস্থিত দর্শকেরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তাদের শব্দ করা নিষেধ। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। এখন শব্দ করে বা না করেই বা কি! আস্তে আস্তে বেশ একটা শোরগোল ওঠে, লোকজন কথাবার্তা বলতে থাকে উত্তেজিত স্বরে, আর তার মাঝে হঠাৎ নান্টুর রিনরিনে গলার স্বর শোনা গেল, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি, পীর সাহেবের জোচ্চুরি—

ম্যাজিকের মতো সবাই চুপ করে যায়, পীর সাহেব পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে থেমে যান। সবাই ঘুরে তাকায় নান্টুর দিকে। নিজের কানকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। কয়েক মুহূর্তে সমস্ত ঘর একেবারে কবরের মতো নীরব, নিঃশ্বাস ফেললে শোনা যায় এরকম। নান্টু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায় একবার, দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল, সম্ভবত বাকি দশ টাকার লোভে একটা কাগজ বের করে সে কাছাকাছি এক জনকে এগিয়ে দেয়, একসাথে কয়েকজন ঝুঁকে পড়ে সেই কাগজের উপর, সেখানে বড় বড় করে লেখা,

"পীর সাহেবের জোচ্চুরি।"

তার নিচে দু'টি প্রশ্ন, "কেন আজ পীর সাহেব পেরেকের বিছানায় শুইতে পারিলেন না?" এবং "কেন আজ পীর সাহেব আগুনের উপর হাঁটিতে পারিলেন না?" প্রশ্নগুলোর নিচে ছোট ছোট হাতের লেখায় প্রশ্ন দু'টির উত্তর।

বেশ কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে নান্টুর দিকে, নান্টু সাহস করে বিলি করতে শুরু করে। এক জন দু'জন করে বেশ কয়েকজন পীর সাহেবের জোচ্চুরির বিবরণ পড়া শুরু করে। দরবারে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে যায়, মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় যে পীর সাহেব একটা জোচ্চোর। হঠাৎ করে সবাই নান্টুকে ঘিরে ধরে এক কপি জোচ্চুরির বিবরণের জন্যে। আমি সবিস্ময়ে দেখি নান্টু হঠাৎ মুখে একটা গাম্ভীর্য এনে হাতের কাগজগুলো বুকে চেপে ধরেছে। লোকজন তাকে ভিড় করে রেখেছে, কিন্তু সে কাগজ হাতছাড়া করছে না, এক জন চাইতেই বলল, পাঁচ টাকা করে দাম, আজকে স্পেশাল রেট দুই টাকা। লোকটি বলল, আগে তো এমনিতেই দিচ্ছিলি—

নান্টু গম্ভীর গলায় বলল, সেইটা হল বিজনেস ট্যাকটিস। নদী মে খাল মিরচা মে ঝাল। নিতে চাইলে নেন না হয় রাস্তা দেখেন, আমার অন্য কাস্টমারের রাস্তা আটকাবেন না।

আমি সবিস্ময়ে দেখি, লোকজন পকেট থেকে টাকা বের করে কাগজ কিনে নিচ্ছে, এক জন দেখলাম দুটো কেনার চেষ্টা করল। কিন্তু নান্টু একটার বেশি কাউকে দিল না। দেখতে দেখতে কাগজ শেষ হয়ে যায়। নান্টু খুচরো টাকার বাণ্ডিল দুই হাতে ধরে রাখে। সবগুলো টাকা রাখার মতো বড় পকেট তার প্যান্টে নেই।

পীর বাবার সাগরেদরাও এক কপি "পীর বাবার জোচ্চুরি" কিনে এনে পড়তে শুরু করেছে। শেষ করার আগেই দেখা গেল তারা হঠাৎ পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। উত্তেজিত জনতা দৌড়ে তাদের ধরে ফেলল, পীর বাবা অবশ্যি পালানোর চেষ্টা করেন নি। পায়ে বড় বড় ফোস্কা বেরিয়ে গেছে। শরবতের গামলায় পা ডুবিয়ে বসে আছেন। কেউ তাঁকে কোলে করে না নিলে এখান থেকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সাগরেদদের নিজেদের জান নিয়ে টানাটানি, এখন কে এই দু'মণি লাশ নিয়ে টানাটানি করবে?

যে সমস্ত ভক্ত মুরীদেরা একটু আগেই পীর বাবার পায়ের তলায় চুমো খাবার জন্যে মারামারি করছিলেন, এখন তাঁরাই পীর বাবাকে তাঁর সাগরেদদের সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়েছেন। নেহায়েত বয়স্ক মানুষ, এছাড়া কিল-ঘুষি যে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পীর বাবার দাড়িটি নকল কি না দেখার জন্যে কৌতূহলী দর্শকরা মাঝে মাঝেই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে যাচ্ছিল, এতেই পীর বাবার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। আমার সাংবাদিক বন্ধুটি দায়িত্বশীল মানুষ, এখানে এসেই আমার পরিকল্পনাটি ধরে ফেলেছিল, তখন-তখনি সে পুলিশে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ এখনো এসে পৌঁছায় নি, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। পীর বাবা আর তাঁর সাগরেদরা তাহলে একটা শক্ত পিটুনি থেকে রেহাই পাবেন!

আমি আর সফদর আলী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসি। সাংবাদিক বন্ধু শেষ

পর্যন্ত থাকতে চান। খুব নাকি একটা জমকালো খবর হবে। নান্টুকে সরানো গেল না, কোনোমতে তার বাকি দশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম। সে তখন বিরাট এক জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতাটি এরকম : আমাকে স্যার বললেন, পীর বেটাকে তো ধরিয়ে দিতে হয়, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি বললাম, নদী মে খাল মিরচা মে ঝাল। বিপদের ভয় আমার নাই, হায়াত-মউত খোদার হাতে। ভালো কাজে জান দিতে হলে দিতে হয়। স্যার বললেন, বাপকা বেটা, চল্ তাহলে ঠিক করি কী করা যায়। তারপর আমি আর স্যার এককাপ চা আর একটা সিগারেট নিয়ে বসি—

আমি তো আর পাষণ্ড নই, কী ভাবে এরকম জমাট গল্পে বাধা দিই?

পরদিন ইচ্ছা করেই অফিসে একটু সকাল সকাল হাজির হলাম, মোড় থেকে খবরের কাগজ কিনে এনেছি কয়েকটা। এসে দেখি আমার আগেই অন্যেরা হাজির। সবাই সুলতান সাহেবের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় "ভণ্ডপীরের দুর্ভোগ" নামে মস্ত বড় ফিচার ছাপা হয়েছে সেখানে। কাল নান্টু যে হ্যান্ডবিলটা বিলি করেছে তার পুরোটা ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার নিজের হাতে লেখা, গর্বে আমার বুক প্রায় দুই আঙুল ফুলে ওঠে। খবরের কাগজে কোথাও অবশ্যি আমার বা সফদর আলীর নাম নেই। ইচ্ছা করেই গোপন করা হয়েছে। পীর সাহেবের কোনো অন্ধ ভক্ত বা কোনো সাগরেদ আবার পিছে লেগে যাবে সেই ভয়ে। হ্যান্ডবিলের প্রথমে পেরেকের বিছানায় শোওয়া এবং আগুনের ওপর হাঁটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে লিখেছি, যেন পড়ে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, মনে হয় ভালোই লিখেছি, কারণ যে-ই পড়েছে সে-ই সবকিছু বুঝে ফেলার মতো মাথা নেড়েছে। হ্যান্ডবিলের নিচের অংশ এরকম :

> *"কিন্তু পীর সাহেবের কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নাই। তিনি যখন পেরেকের বিছানায় শয়ন করেন অথবা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটিয়া যান তখন কোনোরূপ ব্যথা অনুভব করেন না। কারণ তখন বেশি ব্যথা অনুভব হয় না। ইহার কারণ আগেই বলা হইয়াছে, আবার লিখিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না।*
>
> *কিন্তু যদি কোনোক্রমে পেরেকের বিছানার একটি মাত্র পেরেক একটু লম্বা হইয়া যায়, তখন শরীরের সমস্ত ওজন সবগুলো পেরেকে বিভক্ত না হইয়া ঐ একটি পেরেকের উপরে পড়িবে এবং অচিন্তনীয় যন্ত্রণার উদয় হইবে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আজ গোপনে একটি পেরেকের উপর সূচালো একটি লৌহ-নির্মিত টুপি পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ পীর সাহেবের যন্ত্রণাকাতর নর্তন-কুর্দন আপনারা স্বচক্ষে অবলোকন করিবেন।*
>
> *জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, তাই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিলে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব। যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে কিছু ধাতব পদার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি অন্যরকম হইবে, ধাতব পদার্থ প্রচুর তাপধারণ করিতে পারে এবং কেহ তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে চোখের পলকে পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে।*

পীর বাবার জোচ্চুরি ধরিবার জন্য গোপনে আগুনের মধ্যে কিছু নাট–বল্টু ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পীর সাহেব যখন ঐ উত্তপ্ত নাট–বল্টুতে পা দিবেন তাঁহার সকল বুজরুকি ধরা পড়িয়া যাইবে।
ভাই সকল, আজিকার—"

এর পরে পীরদের পিছনে টাকাপয়সা এবং সময় নষ্ট না করে সেটি কী ভাবে ভালো কাজে ব্যয় করা যায় সেটি পরিষ্কার করে লেখা আছে।

খবরের কাগজটা পড়ে শেষ করে সুলতান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, খাঁটি পীর পাওয়া কঠিন। পীর যদি খাঁটি মানুষই হবে, তাহলে টাকাপয়সার দিকে এত ঝোঁক কেন?

আজিজ খাঁ বললেন, হ্যাঁ, খামাখা পেটমোটা একটা পীরকে এতগুলো টাকা খাওয়ালাম। ছোট ছেলেটা কত দিন থেকে বলছিল, একটা ম্যাকানো সেট কিনে দিতে—

মাওলা সাহেব বললেন, এমনিতে আমার পিঠে ব্যথা, তার মাঝে সেদিন জোচ্চোর ব্যাটার লাথি খেয়ে—

সুলতান সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব, আসলে আপনার কথাই আমাদের আগে শোনা উচিত ছিল। পীর–দরবেশের পিছনে টাকা নষ্ট না করে টাকাগুলো একত্র করে গরিব বাচ্চাদের জন্যে দুধ বা পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করলে হত।

মাওলা সাহেব কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা এত জন মানুষ, সবাই যদি মাসে দশ টাকা করেও দিই অনেক টাকা উঠে যাবে।

ইদরিস সাহেব বললেন, ইকবাল সাহেব এসব ব্যাপার ঠিক বোঝেন। তাঁকে প্রেসিডেন্ট করে একটা কমিটি করে ফেললে কেমন হয়?

মাওলা সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, মানুষকে দেখে বোঝা মুশকিল কার ভিতরে কী আছে। এই যে ইকবাল সাহেব, দেখলে মনে হয় মহা ধান্ধাবাজ। অথচ দেখেন ভিতরে কেমন একটা দরদি মন লুকিয়ে আছে।

তাহলে সেটাই ঠিক থাকল, বৃদ্ধ অ্যাকাউনটেন্ট বললেন, আমরা টাকাপয়সা ইকবাল সাহেবের হাতে দিয়ে দেব। ইকবাল সাহেব আপনি যা হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।

আকমল সাহেব মাথা চুলকে বললেন, ইকবাল সাহেবের কথাবার্তায় কখনো বেশি পাত্তা দিই নি। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা–দুটো ভালো ভালো কথা বলেন। অফিস ছুটির পর আধাঘন্টা সবাই যদি বসি, ইকবাল সাহেব যদি একটু গুছিয়ে বলেন, কেমন হয় তা হলে?

সেকশান অফিসার লুফে নিলেন কথাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, খারাপ না আইডিয়াটা। ঐ সময়ে এমনিতে বাসে যা ভিড়!

আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই থামলেন, সুযোগ হল। বললাম, আমাকে একটা কথা বলতে দেবেন?

সবার হয়ে মাওলা সাহেব বললেন, তার আগে বলেন আপনি রাজি আছেন কি না। ঠিক আছে।

সবার মুখে পরিতৃপ্তির একটা হাসি খেলে যায়। সেটাকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দিয়ে বললাম, আমার নামটাও তা হলে পাল্টে ফেলি, কী বলেন? হযরত শাহ বাবা জাফর ইকবাল নকশবন্দী কুতুবপুরী গুলগুলিয়া—কেমন শোনাচ্ছে নামটা?

ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল কারো কারো চোখ এক মুহূর্তের জন্যে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হেরোইন কারবারি

কয়দিন থেকেই শরীরের অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ব্যথা। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, তারপরে আর ঘুম আসতে চায় না। অফিসে একজনকে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম, শুনে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, কী হল?

না, কিছু না। তবে সহকর্মী একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, আমার বড় শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঠিক এরকম লক্ষণ ছিল।

কী হয়েছে তার?

না, কিছু না, শুনে আপনি আবার ভয় পেয়ে যাবেন।

না শুনেই আমি ভয় পেয়ে গেছি, তবু শুনতে চাইলাম, বলুন না, শুনি।

ব্রেন ড্যামেজ আর হার্ট অ্যাটাক একসাথে। ডাক্তার পরে কেটেকুটে দেখেছে লিভার বলতে নাকি কিছু ছিল না। কিডনি দুটোও নাকি একসাথে ফেইল করেছিল। সিগারেট খেত, তাই লাংসের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আমি হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। বসে থাকতে থাকতে আমার 'হার্ট' এবং 'ব্রেন' ব্যথা করতে থাকে। পিঠের কাছে অনেকক্ষণ থেকে শির শির করছে, মনে হয় কিডনি দুটোও কেমন জানি হাল ছেড়ে দিচ্ছে। লিভারটা কোথায় ঠিক জানি না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারি সেটাও প্রায় যায়-যায়। সিগারেট খেয়ে খেয়ে নিশ্চয়ই বুকের বারটা বাজিয়ে ফেলেছি। কারণ একটু পরে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে। দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি না সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বাঁচার শেষ চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দিই কেমন করে? ছুটি নিয়ে আমি তখন-তখনই বের হয়ে পড়লাম আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে। রিকশা করে যেতে-যেতে আমার হাত এবং পায়ের তালু ঘামতে শুরু করে, ডাক্তার বন্ধুর অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কি না সেটা নিয়েই এখন আমার সন্দেহ শুরু হয়ে গেল।

আমার ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে অনেকক্ষণ টেপাটেপি করে দেখল। পাছে সে জিনিসটা হেসে উড়িয়ে দেয়, আমি তাই আমার সহকর্মীর শালার আপন ভায়রা ভাইয়ের ঘটনাটি খুলে বললাম। সে মন দিয়ে শুনে মাথা নেড়ে বলল, তোমার অবস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি ঠিক জানি না কত দূর কি করতে পারব। কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, কী মনে হয় তোমার? বেঁচে যাব এ যাত্রা?

দেখি, অসুখটা তো সহজ নয়।

কি নাম অসুখটার?

অসুখ তো একটা নয়, অনেকগুলো। তাই এর ঠিক একটা নাম নেই। তবে যার এই অসুখগুলো হয় তার নাম হাইপোকনড্রিয়াক।

হাইপোকনড্রিয়াক! কী বীভৎস নাম! কোথায় যেন শুনেছি নামটা ঠিক মনে করতে পারলাম না। ডাক্তার বন্ধুটি একটা বড় ওষুধের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলল, বাসায় গিয়ে শুয়ে থাক। খাওয়ার পর দুটো করে ট্যাবলেট দিনে দশ বার—খবরদার ভুল যেন না হয়।

আমি চলে আসার সময় বলল, তোমার আর আসতে হবে না, রাতে আমি আসব। খালাম্মা ভালো আছেন তো? আর শোন, ভালো-মন্দ যদি কিছু খেতে চাও, খেয়ে নিও। বুঝতেই তো পারছ দু'দিনের দুনিয়া!

ডাক্তার যখন রোগীকে বলে, দু'দিনের দুনিয়া—ভালো-মন্দ কিছু খেয়ে নিও, তখন রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন হয় সেটা নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে দিতে হয় না। আমি কোনোমতে রিকশা করে বাসায় রওনা দিই, মাথা ঘুরতে থাকে আমার। মনে হয় পড়ে যাব রিকশা থেকে। কাওরান বাজারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চায়ের দোকানে সফদর আলীকে দেখে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়লাম। মরি-বাঁচি ঠিক নেই, সফদর আলীর সাথে একবার দেখা করে যাই। সফদর আলী আমাকে দেখে একটু চমকে ওঠেন। বললেন, সে কী! আপনার এ কী চেহারা! কী হয়েছে?

অনেককিছু। একটা অসুখ তো নয়, অনেকগুলো।

কী সর্বনাশ! কবে হল?

এই তো, অনেকদিন থেকে নিশ্চয়ই। মরি-বাঁচি ঠিক নেই।

কিসের অসুখ?

অসুখটার নাম জানি না, তবে যার হয় তাকে বলে হাইপোকনড্রিয়াক।

কী বললেন?

হাইপোকনড্রিয়াক।

কে বলেছে আপনাকে?

আমার মনে হল সফদর আলীর মুখে একটা হাসি উঁকি দিয়ে গেল। একটু রেগে বললাম, আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে, মস্ত বড় ডাক্তার—

সফদর আলী সত্যি দুলে দুলে হাসতে থাকেন। বিজ্ঞানী মানুষের দয়া-মায়া একটু কম হয় জানতাম, কিন্তু এরকম নিষ্ঠুর হয় ধারণা ছিল না। বললাম, হাসছেন কেন আপনি?

হাইপোকনড্রিয়াক মানে জানেন না আপনি?

না।

হাইপোকনড্রিয়াক মানে হচ্ছে যার কোনো অসুখ নেই, কিন্তু মনে করে তার অনেক বড় বড় অসুখ আছে।

আমি হতবাক হয়ে থেমে গেলাম। সত্যিই তো! আমিও তো জানতাম শব্দটা, এখন এই ভয়ে মাথা গুলিয়ে রয়েছে বলে ধরতে পারি নি। থতমত খেয়ে বললাম, কিন্তু

এত বড় বাক্স ভরা ওষুধ দিল যে।

খুলুন দেখি বাক্সটা।

আমি বাক্সটা খুলি। বড় বাক্সের ভেতর একটা মাঝারি বাক্স। মাঝারি বাক্সের ভেতর একটা ছোট বাক্স। ছোট বাক্সটা খুলে দেখি তার ভেতরে কয়টা চিনাবাদাম।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। পাজি বন্ধুটা বলেছে, রাতে আমার বাসায় আসবে, এসে সবার সামনে আমাকে নিয়ে কী ঠাট্টাই না করবে! চিন্তা করে আমার কালঘাম ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু সাথে সাথে আমার আবার ভালোও লাগতে থাকে যে আসলে আমার কোনো অসুখ হয় নি। বুক হালকা হয়ে যায়, শরীর ভালো লাগতে থাকে, হার্ট, কিডনি, লিভার সবকিছু একসাথে ঝরঝরে হয়ে ওঠে।

আমি আর সফদর আলী বসে বসে চিনাবাদামগুলো শেষ করে দিই।

রাতে আমার ডাক্তার বন্ধুটি সত্যি সত্যি তার গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। অনেক দিন থেকে আমার সাথে জানাশোনা, বাসার সবাইকে চেনে। আমাকে নিয়ে বাসার সবার সামনে অনেকক্ষণ খুব হাসাহাসি করল। আমি কী ভাবে অচল হার্ট, ব্রেন, লিভার, কিডনি আর লাংস নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে তার চেম্বারে এসে হাজির হলাম, সেটা সে বেশ কয়েকবার অভিনয় করে দেখাল। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই, মানুষ যখন খুব কাজের চাপে থাকে তখন এধরনের শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। কয়দিন ছুটি নিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে এলে সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসতে বলল।

আমার সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি পাওনা ছিল। ঠিক করলাম ছুটিটা নষ্ট না করে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। একা একা কোথাও গিয়ে মজা নেই। কাকে নেয়া যায়, কোথায় যাওয়া যায় জল্পনা-কল্পনা করতে থাকি। কক্সবাজার, বান্দরবন, সুন্দরবন, সীতাকুণ্ড, সিলেটের চা বাগান, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়—যাওয়ার জায়গার অভাব নেই, তবে উপযুক্ত সঙ্গীর খুব অভাব। হঠাৎ আমার সফদর আলীর কথা মনে পড়ে, তাঁকে যেরকম ব্যস্ত দেখায়, বেড়াতে যেতে রাজি করাতে পারব এমন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বলামাত্র এককথাতে রাজি হয়ে গেলেন! আসলে সফদর আলী ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করেন। এমন জায়গা নেই তিনি যেখানে যান নি, ঘুরে ঘুরে তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। যখন আমি বললাম, কোথায় গিয়ে কোথায় উঠব, কোথায় থাকব—সফদর আলী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার উপর ছেড়ে দিন, ভ্রমণবন্দিটা নিয়ে নেব, কোনো অসুবিধে হবে না।

ভ্রমণবন্দি! সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, ভ্রমণের সময় যা যা লাগে, সব একটা ঝোলার মাঝে বন্দি করে রাখা আছে, তাই এর নাম ভ্রমণবন্দি। কোথাও যেতে হলে আমি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কী কী আছে ভ্রমণবন্দির ভেতরে?

একটা চুম্বক, ইনডাকশান কয়েল, তামার তার, একটা আলট্রাসোনিক অসিলেটর, একটা ছয় ভোল্টের ব্যাটারি—

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, ভ্রমণ করতে এসব লাগে নাকি? এই চুম্বক, ব্যাটারি?

কী বলছেন আপনি? রাঙামাটি পাহাড়ে যখন হারিয়ে গেলাম, কী কুয়াশা, কোনদিকে যাব জানি না। চুম্বকটা ঝুলিয়ে দিতেই উত্তর-দক্ষিণ বের হয়ে গেল, তারপর হাতড়ে হাতড়ে আধ ঘন্টায় তাঁবুতে ফিরে এলাম।

তাঁবু? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি তাঁবুতে থাকেন?

রাঙামাটির ঐ পাহাড়ে আমার জন্যে হোটেল কে বানাবে?

সাপখোপ?

ইনডাকশান কয়েল কি শুধু শুধু নিই? তাঁবুকে ঘিরে তামার তার থাকে, ইনডাকশান কয়েল দিয়ে হাই ভোল্টেজ করে রাখি, সাপখোপ ধারে-কাছে আসে না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমাদের কি তাঁবুতেই থাকতে হবে?

থাকার জায়গা না থাকলে তাঁবুতে থাকব। আমার দুটো স্লিপিং ব্যাগ আছে, আপনার জন্যে একটা নিয়ে নেব।

বন-জঙ্গলে তাঁবুতে থাকতে ভয় করে না আপনার?

কী বলেন আপনি, ভয় করে না আবার? ভীষণ ভয় করে! সফদর আলী শিউরে ওঠেন একবার।

আপনি কি বন্দুকটন্দুক নিয়ে যান?

বন্দুক? সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললেন, বন্দুক দিয়ে কী করব? ভূতকে কখনো গুলি করা যায়?

আপনি ভূতের ভয় পান? জঙ্গলে আপনি ভূতের ভয় পান? আমি অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকি।

আপনি কী ভাবছিলেন?

এই, বাঘ-ভালুক—

বাঘ-ভালুককে ভয় পাবার কী আছে? গায়ে বাঘবন্দি তেল মেখে ঘুমাবেন, বাঘ ধারে-কাছে আসবে না। আলট্রাসোনিক বিপার আছে, বিপ বিপ শব্দ করতে থাকে, পোকা-মাকড় পর্যন্ত পালিয়ে যাবে।

ওরকম শব্দ করতে থাকে, তার মাঝে আপনি ঘুমান কেমন করে?

সফদর আলী একটু হেসে বললেন, ঐ তো বললাম না আলট্রাসোনিক শব্দের কাঁপন এত বেশি যে মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু পশুপাখি পোকা-মাকড় ঠিকই শোনে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, বন-জঙ্গলে এই অন্ধকারে একা একা তাঁবুতে—

— অন্ধকার? অন্ধকার আপনাকে কে বলল?

রাতে অন্ধকার হবে না, বাতি জ্বালিয়ে আলো আর কতটুকু পাওয়া যায়?

বাতি আমি কখনোই জ্বালাই না, পোকা মাকড় এসে ভিড় করে। আমার ইনফ্রারেড চশমাটা পরে নিই, পরিষ্কার দেখা যায় তখন।

ইনফ্রারেড চশমা? সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, খবরদার, কাউকে যেন বলবেন না, অন্ধকারে দেখা যায় এরকম চশমার জন্যে সবরকম লোক

ব্যস্ত হয়ে আছে।

এদিক-সেদিক তাকিয়ে যখন দেখলেন কেউ তাঁর কথা শুনছে না, তখন আমাকে বোঝালেন, ইনফ্রারেড চশমাটি কী জিনিস। আমরা যে আলো দেখতে পাই তার দৈর্ঘ্য যদি বেশি বা কম হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে আর দেখা যায় না। যেসব আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, তাকে ইনফ্রারেড বলে, সেটা নাকি আশ্চর্য কিছু নয়, যে কোনো গরম জিনিস থেকেই অদৃশ্য ইনফ্রারেড আলো ছড়ায়। সফদর আলী একটা চশমা তৈরি করেছেন, যেটা এই ইনফ্রারেড আলোকে সাধারণ আলোতে পরিণত করে দেয়। তাকে সেজন্যে কয়েকটা সি. সি. ডি. ব্যবহার করতে হয়েছে। সেটা কী জিনিস সফদর আলী আমাকে অনেকক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলেন। আমি তবু ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেটুকু বুঝলাম তাতেই চমৎকৃত হলাম, একটা পেশাদার চোর একটা ইনফ্রারেড চশমা পেলে কী খুশি হবে, সেটা আমার জন্যে কল্পনা করাও মুশকিল।

সফদর আলী ভ্রমণের জন্যে আরো কী কী আবিষ্কার করেছেন বললেন, তার "মাংস গুল্লি" 'মাছ গুল্লি" এবং সবজি গুল্লি বলে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, সেগুলো মাংস, মাছ বা সবজিতে ছেড়ে দিয়ে পানি দিয়ে গরম করে নিলেই নাকি রান্না হয়ে যায়। তাঁর সেগুলো বেশি ব্যবহার করতে হয় না, কারণ তাঁর যে "স্বাস্থ্য গুল্লি" আছে, সেটা একটা খেলেই নাকি সারা দিন কিছু খেতে হয় না। এ ছাড়া আছে তাঁর দশবাহারি চুলো, মগ, ডেকচি, সসপ্যান, বালতি, চাকু, শাবল, কোদাল, টেবিল-ল্যাম্প এবং ইঁদুর মারার কল। এই দশটি জিনিসের কাজ করতে পারে বলে এর নাম দশবাহারি চুলো। তার আরেকটি আবিষ্কারের নাম হচ্ছে বাইনো ক্যামেরা। সেটা একই সাথে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা। শুধু তা-ই নয়, সে ক্যামেরাতে নাকি ত্রিমাত্রিক ছবি ওঠে। সফদর আলীর সবচেয়ে মজার আবিষ্কার হচ্ছে "ভূতটিপি", এটি আসলে একটি ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার। ভয় পেলেই এটা তিনি টিপে দেন। তখন সেটা ক্রমাগত আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকে। আয়াতুল কুরসি পড়লে নাকি কখনো ভূত ধারে-কাছে আসে না।

আমরা আমাদের যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। ঠিক করা হল দু'সপ্তাহের জন্যে কক্সবাজার যাব, সেখান থেকে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করা যাবে। বান্দরবন কাছেই, সেখানে শঙ্খ নদী দিয়ে পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত যাওয়া যায়। খুব নাকি সুন্দর জায়গা। ঢাকা থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত ট্রেনে যাব, সেখান থেকে বাস। রাতের ট্রেনে রওনা দিলে ভোরে চাটগাঁ পৌঁছে যাব, তাহলে দিন থাকতে থাকতে কক্সবাজারে হাজির হওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। সাথে একটা স্যুটকেস আর একটা ছোট ব্যাগ। মা জোর করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার ধরিয়ে দিয়েছেন, ভেতরে মাংস-পরোটা থাকার কথা। টিকিট আগে থেকে কিনে রেখেছিলাম, তাই স্টেশনের সামনে সফদর আলীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, পিঠে একটা অতিকায় ঝোলা নানারকম বেল্ট

দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁর শরীরের সাথে বাঁধা। ঝোলা থেকে নানারকম জিনিস বের হয়ে আছে, তলায় ছোট ছোট চাকা, মনে হল উপরে স্টিয়ারিং হুইলের মতো কী একটা আছে, প্রয়োজনে জিনিসটা ছোট একটা গাড়িতে পাল্টে গেলেও আমি অবাক হব না। সফদর আলীর মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা টুপি। টুপির উপরে একটা বাতি, আপাতত সেটা নেভানো আছে। টুপি থেকে দুটি হেডফোনের মতো জিনিস নেমে এসেছে। টুপির উপরে রেডিওর অ্যান্টেনার মতো কী–একটা জিনিস বেরিয়ে আছে। তাঁর পরনে খাকি শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের একটা প্যান্ট। শার্ট আর প্যান্টে সঠিক পকেটের সংখ্যা বলা মুশকিল। বাইরে থেকে অনুমান করি পঞ্চাশ থেকে সত্তরের ভেতরে হবে। তাঁর গলায় তাবিজের মতো কী একটা ঝুলছে। সেটা যদি তাঁর বিখ্যাত ভূতটিপি হয়, আমি অবাক হব না। তাঁর ডান হাতে লাঠির মতো একটা জিনিস, হাতের কাছে অসংখ্য সুইচ দেখে বুঝতে পারি এটি সাধারণ লাঠি নয়।

বলাই বাহুল্য, সফদর আলীকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। তিনি সেটাকে গ্রাহ্য না করে বললেন, চলুন প্ল্যাটফরমে যাই।

চলুন—আমি তাঁর মতো লোকজনের কৌতূহলের বিষয় হয়ে অভ্যস্ত নই, তাই তাড়াতাড়ি তাঁর পিছু পিছু সরে পড়ার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যবশত প্ল্যাটফরমে এক জন আধপাগল গোছের লোক তার রসগোল্লায় মিষ্টি কম ছিল দাবি করে এক জন মিষ্টির দোকানির সাথে এমন হৈচৈ করে ঝগড়া শুরু করেছে যে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়টা আমাদেরকে ঘিরে তৈরি না হয়ে তাদের দিকে সরে গেল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, সবকিছু এনেছেন তো?

হ্যাঁ। কানের হেডফোনটা দেখিয়ে বললেন, সময়টা খারাপ, তাই এটা তৈরি করে নিলাম।

কী এটা?

আবহাওয়া অফিস। সরাসরি স্যাটালাইটের সাথে যোগাযোগ। ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি সুবিধের নয়, একটু ডিস্টরশান হয়।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও।

কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রেন লাগিয়ে দিল। আমরা উঠে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসি। ট্রেনে বেশ ভিড়। ঘুমাতে পারব কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু এক রাতের ব্যাপার, আমরা বেশি মাথা ঘামালাম না।

কক্সবাজার পৌঁছলাম পরদিন প্রায় বিকেলের দিকে। রাতে ভালো ঘুম হয় নি, সারা দিন বাসের ঝাঁকুনি। কিন্তু সে হিসেবে বেশ ঝরঝরে আছি, মনে হয় সকালে সফদর আলী যে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছিলেন তার ফল। কালোমতন বিদঘুটে ট্যাবলেট, ভেতরে কী ছিল কে জানে! বাসে আমাদের পাশে দু' জন কলেজের ছেলে বসেছিল। তাদের কাছে শুনলাম কক্সবাজার পার হয়ে আরো পাঁচ ছয় মাইল গেলে নাকি চমৎকার নিরিবিলি এলাকা। একটা নাকি চমৎকার থাকার জায়গা আছে। ছেলে দু'টি আমাদের জায়গাটার নাম, কী ভাবে যেতে হয় গুছিয়ে বলে দিল। আমার নিজের এত বেশি নিরিবিলিতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সফদর আলীর খুব উৎসাহ। লোকজনের ভিড় তাঁর ভালো লাগে না, তিনি যেভাবে চলাফেরা করেন, সবসময়েই তাঁকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে ওঠে, তিনি যে নিরিবিলিতে থাকতে চাইবেন

এতে অবাক হবার কী আছে?

খুঁজে খুঁজে আমরা যখন ঠিক জায়গায় হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষের রাত, চমৎকার চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রে তার প্রতিফলন দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়, সফদর আলীর মতো এরকম কট্টর বিজ্ঞানী মানুষ পর্যন্ত খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী চমৎকার লাগছে! দেখেছেন কেমন কোমল একটা ভাব?

আমি মাথা নাড়লাম।

আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? চাঁদের আলোতে রং বোঝা যায় না। আমাদের চোখের রেটিনাতে তখন শুধু রডগুলো কাজ করে। রডগুলো রং ধরতে পারে না, তাই কন্ট্রাস্ট কমে যায়, মনে হয় খুব কোমল।

জিনিসটি বুঝিয়ে দেয়ার পরও আমার কিন্তু ভালোই লাগে।

আমরা হোটেলের দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকি। আমাদের শব্দ শুনে মাঝবয়সী এক জন লোক বেরিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের পোশাক দেখার মতো, শৌখিন মানুষের হাতে পয়সা হলে যা হয়। চকচকে কাপড়–জামা তো আছেই, তার উপর হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মোটা মোটা আংটি, গলায় সোনার চেন। ভদ্রলোক আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন, আমি বললাম, আপনাদের ঘর খালি আছে? সপ্তাহ দুয়েক থাকার মতো?

দু' সপ্তাহ? ভদ্রলোক খুশি না হয়ে মনে হল একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

জ্বি।

আছে ঘর কয়েকটা। কাউন্টার থেকে কাগজপত্র বের করতে করতে বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

ঢাকা।

প্লেনে এলেন?

না, ট্রেন আর বাস।

ও! তাহলে তো আপনাদের অনেক ধকল গেছে। ঠিক আছে, আগে আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই, দু'জনের জন্যে ভালো একটা ঘর আছে। নাম লেখালেখি করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক কাউন্টার থেকে চাবি বের করে এগিয়ে যান, আমরা পিছু পিছু যেতে থাকি।

ঘর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। চমৎকার ঝকঝকে ঘর। দু'পাশে দু'টি সুদৃশ্য বিছানা, জানালার পর্দা টেনে দিলে সমুদ্র দেখা যায়। ঘরের সাথে বাথরুম, সামনে বারান্দা। ভেতরে টেবিল, টেবিলে সুদৃশ্য কাচের জগে পানি। এত আয়োজনের তুলনায় ঘরভাড়া খুব কম, আমি অবাক না হয়ে পারি না। ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে জানলাম তিনিই হোটেলের মালিক, নিজেই দেখাশোনা করেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। একা একা নিরিবিলি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। আমাদের গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন, যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোথায় আমরা খেতে পারব, এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নাকি ভালো রেস্তরাঁ আছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দু'জনে অনেক সময় নিয়ে গোসল করে পরিষ্কার জামা–কাপড় পরে বের হলাম। চাঁদের আলোতে সমুদ্রের তীর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনটা অকারণেই খুশি হয়ে ওঠে। খুঁজে খুঁজে রেস্তরাঁটি বের করে খেয়ে নিলাম দু'জনে। খুব

উঁচুদরের খাবার, সেরকম দাবি করব না, এ অঞ্চলের মানুষেরা বোধহয় ঝাল একটু বেশিই খায়। সফদর আলীর পকেটে "ঝালধ্বংস" ট্যাবলেটটা না থাকলে খেতে পারতাম কি না সন্দেহ। একটা ছোট ট্যাবলেট মাছের ঝোলে ছেড়ে দিতেই সে সব ঝাল শুষে নিল, সত্যি বলতে কি, স্বাদও খানিকটা শুষে নিয়ে স্বাদটা কেমন জানি পানসে করে দিল। পেটে খিদে ছিল, তাই খেতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি।

খেয়ে বের হয়েছি, একটু হাঁটতেই মনে হল যেন একটা মাছের বাজার। মাছের আঁশটে গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু অনেক লোকজন। খাওয়ার ঠিক পরপরই এরকম আঁশটে গন্ধ ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু সফদর আলী গোঁ ধরলেন তিনি বাজারটা দেখবেন। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনা হয়েছে, বড় বড় কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে পাইকারি বেচাকেনা হচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাছ, দেখে তাক লেগে যায়। ভিড়ে এক জায়গায় মাঝারি একটা হাঙরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, সাবধান!

কী হল?

এক জন লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে।

সফদর আলী আগেও অনেক বার দাবি করেছেন, তাঁকে নাকি সি. আই. এ. এবং কে. জি. বি.-র লোকেরা অনুসরণ করে বেড়ায়, কখনো বিশ্বাস করি নি। এবারেও আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফদর সাহেব ভুরু কুঁচকে চিন্তিত মুখে গোঁফ টানতে লাগলেন। আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোকটা?

আসেন, দেখাচ্ছি।

বাজার থেকে বের হয়ে একটু হেঁটে এগিয়ে যেতেই দেখি সত্যি তাই। আমরা একটু এগুতেই একটা লোক এগোয়, আমরা দাঁড়াতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে কালঘাম ছুটে যাবার মতো অবস্থা। কী করব বুঝতে পারছিলাম না, বাজারে ভিড়ের মধ্যেই ভালো ছিলাম, রাস্তাটা এদিকে আবার বেশ নির্জন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাজারে ফিরে যাব কি না ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকটার হাতে একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠল, আলো ফেলে ফেলে লোকটা এগিয়ে আসতে থাকে সোজা আমার দিকে। কাছে এসে আমার মুখে আলোটা ফেলে মেঘস্বরে বলল, দাঁড়ান এখানে।

ভয়ে আমার কাপড় জামা-নষ্ট হবার অবস্থা, তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললাম, আমি?

আমার ধারণা ছিল লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে সফদর আলী বলে ভুল করেছে; কিন্তু দেখা গেল তা নয়। লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো কুচকুচে পিস্তল বের করে আনে, আমার দিকে তাক করে বলে, হ্যাঁ, আপনি। একটা টুঁ শব্দ করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে ঘিলু বের করে দেব।

আমি মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে দেখি সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী একটা জিনিস বের করে লোকটার দিকে তাক করেছেন। কিছু বোঝার আগেই তিনি হঠাৎ সুইচ টিপে দিলেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা নীল আলো বের হল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটা আর্তনাদ করে দশ হাত

দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। হাত থেকে টর্চ আর পিস্তল ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। তার মাঝে সফদর আলী দৌড়ে লোকটার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, একটু নড়বে না, নড়লেই আরেকটা দেব, ডাবল করে দেব পাওয়া—

আমি বললাম, কথা বলছেন কি? আরেকটা দিয়ে দিন আগে, নড়ছে যে এখনো।

লোকটার নড়ার আর কোনো ইচ্ছা নেই, কাতর স্বরে বলল, ইকবাল, আমাকে বাঁচা। আমি মতিন, ঠাকুরপাড়ার মতিন।

আমার সম্বিত ফিরে আসে, দৌড়ে টর্চলাইটটা তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যাই, সত্যিই মতিন, চোখে আলো ফেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল বলে দেখতে পাই নি, না হয় মতিনকে না চেনার কোনো কারণ নেই, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার মুখে কথা সরে না, তোতলাতে তোতলাতে বলি, তু-তু-তু-তুই—

সফদর আলী ততক্ষণে মতিনের বুক থেকে পা সরিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। সে উঠে হাতড়ে-হাতড়ে পিস্তলটা তুলে নেয়, বার কয়েক লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, বাজারে দেখলাম তোকে। ভাবলাম, তুই যেরকম ভীতু, একটু মজা করি তোর সাথে। সর্বনাশ—আরেকটু হলে তো মরেই গিয়েছিলাম!

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, ইনি সফদর আলী, আমার বন্ধু।

মতিন তখনো হাঁপাচ্ছে, কোনোমতে বলল, খালি গল্প শুনেছিলাম স্টান্টগানের, আজ দেখলাম।

স্টান্টগান?

হ্যাঁ, যেটা দিয়ে মারলেন আমাকে।

ও! সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট হাতলওয়ালা জিনিসটা বের করলেন, এটাকে স্টান্টগান বলে নাকি? জানতাম না তো!

জানতেন না মানে? মতিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, লাইসেন্স করান নি?

লাইসেন্স?

বন্দুক লাইসেন্স করাতে হয় জানেন না? কে বিক্রি করেছে আপনাকে?

আমাকে কেউ বিক্রি করে নি, আমি নিজেই তৈরি করেছি।

মতিন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, সফদর আলী হচ্ছেন বিজ্ঞানী মানুষ, অনেক কিছু ইনি তৈরি করেছেন।

সফদর আলী বিরস মুখে স্টান্টগানটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, খানিকক্ষণ পর আস্তে-আস্তে বললেন, জন্ম নিতে-নিতে একটু দেরি হয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

একটু ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলেন, দেখছেন না, যেটাই তৈরি করি সেটাই আগে আবিষ্কার হয়ে গেছে! বাকি আছে কী?

মতিন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? তুই যখন বন্দুকটা ধরলি, ভয়ে পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, এখন মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, আছে। ঐ তো ওদিকে—হঠাৎ করে পেট খারাপ নাকি?

সফদর আলী বললেন, নার্ভাস ডাইরিয়া। ভয় পেলে হয়, হঠাৎ করে

ইনটেস্টাইনে—

ব্যাখ্যাটা শোনার সময় ছিল না, মতিনের সাথে আমি দৌড়ালাম।

মতিন কী কাজ করে বলা মুশকিল। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্সের লোক। পরিষ্কার করে কখনো বলে না, কে জানে হয়তো বলা নিষেধ। একসাথে দু'জন কলেজে গেছি, কিন্তু এখন দেখা হয় খুবই কম। খুব ব্যস্ত ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে এখানে দেখব কখনো চিন্তাও করি নি। কোথায় এসেছে, কী করছে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, প্রশ্নগুলো খুব কায়দা করে এড়িয়ে যায়। আমাদের দু'জনকে তার বাসায় নিয়ে এসেছে, কাছেই বাসা। আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে মতিন খুটিয়ে খুটিয়ে সফদর আলীকে দেখে, একটু ভয়ে ভয়েই। এরকম একটা সংঘর্ষ দিয়ে পরিচয়, ভয় না করে উপায় কি? চেয়ার টেনে একটু দূরে বসে, সফদর আলী একটু ক্ষেপে তাকে আরেকটা শক্ দেন, সেই ভয়ে কি না কে জানে।

আমি ভয়টা ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন টেলিফোন বেজে ওঠে। মতিন ব্যস্ত হয়ে গিয়ে টেলিফোনটা ধরে, হ্যালো, কে? মজুমদার?

ওপাশ থেকে কী বলল কে জানে, মতিনের গলার স্বর হঠাৎ নেমে আসে। শোনা যায় না, এমন। গোপন জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে, চায় না আমরা শুনি। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। সফদর আলীর কথা ভিন্ন, মতিনের গলার স্বর নিচু হতেই তাঁর কান যেন খাড়া হয়ে ওঠে, তিনি গলা লম্বা করে ঘাড় বাঁকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে মতিনের কথা শোনার চেষ্টা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকেন, যেন সবকিছু বুঝে ফেলছেন। দেখে আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা।

মতিন কথা শেষ করে একটু অপরাধীর ভঙ্গি করে ফিরে এসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সফদর আলী বাধা দিয়ে বললেন, অবস্থা তাহলে সত্যিই খারাপ?

মতিন থতমত খেয়ে বলল, কিসের অবস্থা?

হেরোইন তৈরি। এখানেও তৈরি শুরু করেছে তাহলে?

মতিনের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খানিকক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারে না। আবার যখন চেষ্টা করে তখন গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, আপনি—মানে আপনি কী ভাবে জানেন?

টেলিফোনে কথা বলছিলেন, তা-ই শুনছিলাম।

কিন্তু টেলিফোনে আমি তো কথা বলছিলাম না, শুনছিলাম।

একটা দুটো কথা তো বলছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায়। সফদর আলী গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা যত বার ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বার ওরা পালিয়ে যায়?

মতিনের মাথায় মনে হয় বাজ পড়ল। সে ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা চেয়ার ধরে সামলে নেয়। ঢোক গিলে বলল, কী বললেন?

যত বার বর্ডারে ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বারই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে যায়?

মতিনের মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, অনেকক্ষণ লাগে ওর কথা বলতে। যখন বলে তখন গলার স্বর শুনে মনে হয় একটা ফাটা বাঁশের ভেতর দিয়ে কথা বলছে। তোতলাতে–তোতলাতে বলল, সা–সাঙ্ঘাতিক গোপন ব্যাপার এটা, সারা দেশে মাত্র দশ বার জন লোক জানে। বাইরের কিছু দেশ সাহায্য করছে খবরাখবর দিয়ে, কিন্তু আপনি কী ভাবে জানলেন?

সফদর আলীর মুখ খুশিতে হাসি হাসি হয়ে ওঠে, কেন ও তো খুবই সহজ। কথা বলতে বলতে আপনি একসময় বললেন, অ্যাসিড। অ্যাসিড কোথায় কাজে লাগে, হেরোইন তৈরি করতে। তার মানে এখানে কোথাও হেরোইন তৈরি হচ্ছে। এখন পপি ফুলের সময়, পপি ফুল থেকে হেরোইন তৈরি হয় এ তো সবাই জানে। মতিনের দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। কী একটা বলতে যাচ্ছিল। সফদর আলী বাধা দিলেন। তারপর একসময় বললেন, "চিড়িয়া", পুরোটা শুনতে পাই নি, নিশ্চয়ই বলেছেন "চিড়িয়া উড় গিয়া", মানে পাখি উড়ে গেছে। তার মানে কী হতে পারে? অতি সহজ—আপনারা যখন ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছেন সবাই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে গেছে। বোঝা কঠিন কি?

মতিনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার একটু ভয় ভয় করতে থাকে, সে ফ্যাকাসে মুখে এক বার সফদর আলীর দিকে, এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল কেঁদে দেবে। কিন্তু কাঁদল না। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, হেরোইন ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সফদর আলী বললেন, বললাম না, খুবই সহজ ব্যাপার।

মতিন বলল, কিন্তু ধরেছেন একেবারে ভুল করে। আমি যখন "অ্যাসিড" কথাটা বলেছি, তখন আমার উপরওয়ালার অ্যাসিড অ্যাসিড মন্তব্যের কথা বলছিলাম। যখন চিড়িয়ার কথা বলেছি, তখন এক জন ইনফরমারের কথা বলছিলাম, সে হচ্ছে এক আজব চিড়িয়া।

এবারে সফদর আলীর চোয়াল ঝুলে পড়ে। অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে কী একটা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বোকার মতো হেসে উঠি, সে হাসি আর কিছুতেই থামাতে পারি না। আমার দেখাদেখি প্রথমে মতিন তারপর সফদর আলীও হাসতে শুরু করেন।

অনেকক্ষণ লাগে আমাদের হাসি থামাতে। তার ভেতর আবার চা এসে যায়। আমরা খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে নিই। মতিন পুরো ব্যাপারটিতে এত অবাক হয়েছে যে বলার নয়, সম্পূর্ণ ভুল জিনিসের উপর ভিত্তি করে কেউ যে এরকম পুরোপুরি একটা সত্যি জিনিস বের করে ফেলতে পারে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ব্যাপারটা আমরা যখন জেনেই গেছি তখন আর গোপন করে কী হবে। মতিন সবকিছু খুলে বলে, অবশ্যি আমাদের কথা দিতে হয় সেটা কাউকে বলব না। জিনিসটা জানাজানি হয়ে গেলে হেরোইন কারবারিদের আর ধরা যাবে না।

হেরোইন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মাদকদ্রব্যের একটা। খুব সহজেই মানুষ হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন নিয়মিত হেরোইন না নিয়ে উপায় থাকে না। পাশ্চাত্যে যত অপরাধ হয় তার বড় একটা কারণ হচ্ছে এই হেরোইন। পৃথিবীর নানা দেশে এটা তৈরি হয়, তারপর গোপনে পাঠানো হয় পাশ্চাত্যে। কোটি কোটি টাকার

ব্যবসা এই হেরোইন দিয়ে। আগে এটা বার্মায় তৈরি হত, সেখানে পুলিশের ধাক্কা খেয়ে এখন সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে এসেছে। পাহাড়ের উপর গোপন ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে হেরোইন। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, যত বার খবর পেয়ে ওদের ধরতে গিয়েছে, ওরা কী ভাবে কী ভাবে খবর পেয়ে পুরো ল্যাবরেটরি তুলে পালিয়ে গেছে। ল্যাবরেটরি অবশ্যি এমন কিছু জমকালো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট বাসনপত্র, কোরোসিনের চুলো, কিছু কেমিক্যাল সরিয়ে নেয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সবচেয়ে যেটা দুশ্চিন্তার বিষয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বারই ওরা আগে কী ভাবে জানি খবর পেয়ে যায়। কেউ নিশ্চয়ই আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। কী ভাবে সেটা হয় কেউ বলতে পারছে না। অনেকে সন্দেহ করছে পুলিশে বোধহয় ওদের লোক আছে। ব্যাপারটা তাই বাড়াবাড়ি রকম গোপন।

সবকিছু শুনে সফদর আলী খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এরকম ব্যাপার তিনি আগে শোনেন নি। মতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, ল্যাবরেটরিটা কতদূর এখান থেকে?

তিরিশ মাইলের মতো। প্রথম দশ মাইল রাস্তা আছে, জিপে যাওয়া যায়। বাকিটা হেঁটে যেতে হয়। অনেক সময় লাগে পৌঁছুতে।

তার মানে ওরা পালিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পায়।

হ্যাঁ।

খবরটা নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসে পায়।

নিশ্চয়ই, এর থেকে ভালো উপায় কি হতে পারে?

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, ওদের কেউ যদি রাস্তার ওপর চোখ রাখে, তাহলে আপনারা যখন জিপে রওনা দেন, দেখেই তো বুঝে ফেলবে। সাথে সাথে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, আমরা তাই যখন জিপে রওনা দিই তখন চেষ্টা করি ওয়্যারলেসে কোনো কথাবার্তা, সংকেত ধরতে পারি কি না।

কী ভাবে করেন সেটা? সফদর আলী তার মনের মতো বিষয় পেয়ে প্রায় ডুবিয়ে দেন নিজেকে, কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে খোঁজেন?

মতিন মাথা চুলকে বলল, সেটাই হয়েছে মুশকিল। ফ্রিকোয়েন্সি তো একটা দু'টা নয়, অসংখ্য—একটা মস্ত বড় রেঞ্জ। এখানে এয়ারপোর্ট আছে, জাহাজের ফ্রিকোয়েন্সি আছে, পুলিশ আর্মির ফ্রিকোয়েন্সি আছে, আজকাল আবার স্যাটালাইট থেকে আসছে, পাবলিকের ফ্রিকোয়েন্সিতে তো হাতই দেয়া যায় না। কী ভাবে যে ঠিক ফ্রিকোয়েন্সিটা বেছে নেয়া যায়, সেটাই হচ্ছে মুশকিল।

সফদর আলী উৎসাহে আরো এগিয়ে আসেন, ঠিক যখন আপনারা রওনা দেন তখন যদি হঠাৎ করে কোনো সিগন্যাল পাঠানো হয় এই এলাকা থেকে—

মতিন মাথা নেড়ে বলল, সেটাই করতে চাচ্ছি। যদি সেই সিগন্যালটা শুনতে পাই, ধরতেও তো হবে। আমাদের কাছে ভালো যন্ত্রপাতি নেই, পাঠাতে লিখেছি হেড অফিসে, শুধু দেরি করছে।

সফদর আলীর চোখ চকচক করে ওঠে, আমার কাছে একটা আছে, রিজোলিউশন বেশি নয়, তবে—

মতিন চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার কাছে আছে? আপনি কী করেন এটা

দিয়ে?

সফদর আলী লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, তৈরি করেছিলাম অন্য কাজে, ভেবেছিলাম যদি সমুদ্রে যাই জেলে নৌকা করে, হঠাৎ হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা একটু পাল্টে নিলেই ব্যবহার করা যাবে। যদি আমি—

আমাকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে দু'জনে খুব উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে, সফদর আলীর জিনিসটা কী ভাবে কাজ করে সেটাই আলোচ্য বিষয়। ফ্রিকোয়েন্সি, এফ. এম., এ. এম. মডুলেশান, ডিমডুলেশান, ট্র্যাকিং, ফিডব্যাক—এধরনের কথাবার্তা আলোচনা হতে থাকে। আমি চুপচাপ বসে বসে হাই তুলতে থাকি, দু'জনের কেউই ঘুরে পর্যন্ত তাকায় না। বসে বসে আমি অধৈর্য হয়ে উঠি আর আমার রাগটা ওঠে সফদর আলীর ওপর। এখন বসে বসে এসব নিয়ে কচকচি না করলে কী হত? বসে বসে বিরক্ত হতে হতে একসময়ে আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলতে শুরু করে। ঠিক করলাম সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। বেড়াতে এসে যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ফিডব্যাক নিয়ে কচকচ করতে থাকে, ভূতের ভয় দেখিয়েই তাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। কী ভাবে করা যায় সেটাও মনে মনে ছকে ফেললাম। ঘুমানোর আগে একটা দুটো ভূতের গল্প করব সফদর আলীর সাথে। গোরস্থানের গোর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করার একটা গল্প আছে ভয়ানক। লাশকাটা ঘরেরও ক'টা গল্প জানি। ভীষণ ভয়ের সেটা। হোটেল সম্পর্কে কিছু আজগুবি জিনিস শুনিয়ে তাকে আগে থেকে নরম করে রাখা যাবে। রাতের বেলা কাউকে রাজি করাতে হবে সাদা চাদর জড়িয়ে হাজির হতে। সফদর আলীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটা নাকিকান্না দিলেই হবে। সফদর আলীকে তাহলে আর দেখতে হবে না। ভয় পেয়ে তিনি তার ভূতটিপি টিপে টিপে কী অবস্থা করবেন চিন্তা করেই আমার হাসি পেয়ে যায়। বোধহয় সত্যি সত্যি হেসে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আর মতিন কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন বলল, কী হল?

নাহ্, কিছু না। আমি অপ্রতিভভাবে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসিটাতে মনে হল একটু কাজ হল, কারণ মতিন তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সর্বনাশ, অনেক রাত হয়ে গেছে, তোরা তো ঘুমাবি! সারা দিন ট্রেনে-বাসে কষ্ট করে এসেছিস।

সফদর আলী কিছু বলার আগেই আমি তার কথাটি লুফে নিলাম, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলেছিস, শরীরটা জুত করতে পারছে না।

সফদর আলীর মনে হল এরকম জমাট বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাধা পড়ল বলে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু আপত্তি না করে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। মতিন বলল, চল্ পৌঁছে দিয়ে আসি তোদের। এখানে আমাকে একটা ভাঙা জিপ দিয়েছে। জিপটা যদি স্টার্ট নেয়, তোদের তাহলে হেঁটে যেতে হবে না।

জিপটা বেশ সহজেই স্টার্ট নিল, দেখে মনে হল সফদর আলী যেন একটু হতাশ হলেন। যদি স্টার্ট না নিত তিনি হুড খুলে জিপের যন্ত্রপাতি একটু টেপাটেপি করার সুযোগ পেতেন। রওনা দেবার আগে মতিন জিজ্ঞেস করল, কোথায় উঠেছিস তোরা?

আমি হোটেলের নাম বলতেই মতিন বলল, তাই নাকি? আমরা সন্দেহজনক মানুষদের নামের যে লিস্ট বানিয়েছি, তোদের হোটেলের মালিকের নাম আছে তাতে।

সে কী! আমি অবাক হয়ে বললাম, চমৎকার ভালো মানুষ এক জন, সে বেচারা কী দোষ করল?

কোনো দোষ করে নি, কিন্তু তবু খানিকটা সন্দেহ আছে। হেরোইন আজকাল নাকি ঢাকা এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশি বাজারে চালান দেয়া হয়। তার মানে এই এলাকার কোনো লোক কাজকর্ম না করেই হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে উঠছে কি না, ঢাকা যাচ্ছে কি না ঘন ঘন, এইসব রুটিন ব্যাপার আর কি। প্রায় জনা ত্রিশেক লোককে আমরা সন্দেহ করি, তার মাঝে তোদের হোটেলের মালিকও আছে।

খামোখা সন্দেহ করেছিস মনে হয়, আমি না বলে পারলাম না, চমৎকার ভালোমানুষের মতো চেহারা, কী সুন্দর ব্যবহার!

তোরা তো আছিস হোটেলে, দেখিস তো লোকটা সন্দেহজনক কিছু করে কি না। আবার বাড়াবাড়ি কিছু করিস না যেন।

কোনো ভয় নেই তোর, আমি মতিনকে সাহস দিই, পাকা ডিটেকটিভদের মতো কাজ করব আমরা।

সফদর আলী বললেন, ওর ঘড়িটা খুলে আমার মাইক্রোট্রান্সমিটারটা ঢুকিয়ে দিতে পারলে—

মতিন বাধা দিয়ে বলল, না না না, সর্বনাশ! ওসব জিনিসের ধারে-কাছে যাবেন না, খবরদার!

সফদর আলীর একটু মন খারাপ হয়ে গেল বলে মনে হল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। নতুন জায়গায় ঘুমালে আমার সবসময় এরকম হয়। হঠাৎ মনে পড়ল আমি কোথায়, সাথে সাথে মনে পড়ল যে আমি ছুটি কাটাতে বেড়াতে এসেছি। অনেক বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু ওঠার কোনো তাড়া নেই, চিন্তা করেই আমার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়, ভাবলাম আরো খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিই, কিন্তু আর ঘুম আসতে চাইল না। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়লাম, পাশের বিছানাতে সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো শুয়ে আছেন। তাঁকে না জাগিয়ে বাথরুমে গেলাম দাঁত মেজে গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলতে। অনেক সময় নিয়ে সবকিছু শেষ করে যখন বের হয়ে এলাম, তখনো সফদর আলী ঘুমে। ঘড়িতে তখন দশটা বেজে যাচ্ছে। তাঁকে না জাগিয়ে আমি বেরিয়ে আসি, সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। হোটেলের সামনে একটা খুব আরামের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে আমাদের হোটেলের মালিক। তার হাতে দু'টি কবুতর, নিচে আরো কয়েকটি দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ভদ্রলোকের খুব পাখির শখ বলে মনে হয়। আমাকে দেখে ভালোমানুষের মতো হাসলেন, আমিও দাঁড়িয়ে ভদ্রতার একটা দুইটা কথা বললাম। মতিন বলেছিল, হোটেল মালিক সন্দেহজনক কিছু করে কি না দেখতে, কিন্তু এরকম নিরীহ গোবেচারা মানুষ সন্দেহজনক কী করতে পারে আমি বুঝে পেলাম না। আমি তবুও পাকা ডিটেকটিভের মতো সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকি, কবুতরগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না।

বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজবে কেটে গেছে, হঠাৎ শুনি জিপের শব্দ। মতিন আসছে

কি না দেখার জন্যে চোখ তুলে দেখি কটা জিপভর্তি পুলিশ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এদিকে গাড়ির যাতায়াত কম, তাই একটা কিছু গেলেই দশজন দাঁড়িয়ে দেখে, হোটেল মালিকও ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখলেন। জিপটা কোথায় কেন যাচ্ছে বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। এখন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রাখলেই বুঝতে পারব সে সন্দেহজনক কিছু করছে কি না। সে যদি হেরোইন কারবারিদের এক জন হন, তাহলে তাঁকে এখন উঠে পড়তে হবে। ঘরের ভেতরে গোপন কোনো ওয়্যারলেসে খবর পাঠাতে হবে। পাকা ডিটেকটিভদের মতো আমি ঠিক করলাম তা হলে আমি কী করব, আমিও তাহলে সফদর আলীকে ডেকে তুলব ওয়্যারলেসের সংকেতটা ধরতে।

হোটেল মালিক জিপটাকে দূরে প্রায় অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, পুলিশ মাঝে মাঝেই ওদিকে যায়, আরাকান থেকে ডাকাত আসে কি না কে জানে।

আমি বললাম, তাই নাকি?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বসে থাকেন। ওঠার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। বসে বসে কবুতর নিয়ে খেলতে থাকেন। খুব শখের কবুতর নিশ্চয়ই।

প্রায় মিনিট পনের পার হয়ে গেল। ভদ্রলোক তবু চুপচাপ বসে রইলেন। হেরোইন কারবারি হলে এতক্ষণে উঠে যেতেন নিশ্চয়ই। হোটেল মালিক শুধু যে বসে আছেন তাই নয়, ওঠার জন্যে উসখুস পর্যন্ত করছেন না। কবুতর নিয়ে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দিয়ে আরামের চেয়ারটাতে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকেন। হোটেলের এক জন কর্মচারী এসে একবার কোন-কোন রুমের বিছানার চাদর পাল্টাতে হবে জিজ্ঞেস করে গেল। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়েই তার সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি উঠে একটু এদিক-সেদিক হেঁটে আসি। হোটেল মালিককে কিন্তু সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছিলাম। একসময় দেখি সফদর আলী বেশ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছেন। আমার খোঁজেই সম্ভবত। সফদর আলী আমার কাছে এলে আমি তাকে পুরো ঘটনাটি বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খুলে বললাম, একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো। সফদর আলীর উৎসাহ আমার থেকে বেশি। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে তার সেই যন্ত্র বের করে এলেন। হোটেল মালিক চেয়ার থেকে উঠে ভেতরে গেলেই তিনি সেটা চালু করে দেবেন। এই হোটেল থেকে যদি খবর পাঠানো হয় তাহলে নাকি সেটা ধরে ফেলা পানির মতো সোজা। হোটেল মালিক কিন্তু উঠলেন না, মনে হল চেয়ারে বসে বসে একসময় যেন একটু ঘুমিয়েই পড়লেন।

আমাদের সকালে নাস্তা করা হয় নি, খিদে বেশ চাগিয়েই উঠেছে। কিন্তু ডিটেকটিভের এরকম একটা দায়িত্ব ছেড়ে তো যেতে পারি না। প্রায় দু'ঘন্টা পর হোটেল মালিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সাথে সাথে আমরাও উঠে পড়ি। সফদর আলী গুলির মতো ঘরে চলে গেলেন, আমি হোটেল মালিকের পিছু পিছু। হোটেল মালিক ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে বসে গুন-গুন করে কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাগজপত্র দেখতে থাকেন। সামনের সোফাতে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ে ছিল আমি সেটা দেখার ভান করে তাঁকে লক্ষ করতে থাকি একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো।

প্রায় ঘন্টা তিনেক হোটেল মালিককে চোখে চোখে রেখে বুঝতে পারি যে খামাখা সময় নষ্ট হল। জীবনের প্রথম ডিটেকটিভ কাজের যে এরকম বৈচিত্র্যহীন একটা অভিজ্ঞতা হবে কে জানত। প্রচণ্ড খিদেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে। সকালে নাস্তা পর্যন্ত হয় নি। আমার অবস্থা তবু ভালো হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলাম, সফদর আলী বেচারা সেই যে ঘরে ঢুকে তার যন্ত্রপাতি খুলে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসেছেন একবার ওঠেন নি পর্যন্ত।

আমরা দু'জনে ডিটেকটিভের কাজে ইস্তফা দিয়ে বের হলাম, প্রথমে কিছু একটা খেতে হবে তারপর মতিনকে খুঁজে বের করে রিপোর্ট দেওয়া। মনে মনে আশা করছিলাম হোটেল মালিককে বোকা বানিয়ে পুরো হেরোইন কারবারির দলটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলব, খবরের কাগজে আমাদের ছবিটবি উঠে যাবে। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, হোটেল মালিক বেচারা নেহায়েতই নিরীহ গোবেচারা এক জন মানুষ।

মতিনকে তার বাসায় পাওয়া গেল না, ভোরবেলা নাকি বেরিয়ে গেছে। আমরা খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে বেড়াই। সফদর আলীর সাথে ঠিক কথাবার্তা বলা যাচ্ছে না। তিনি খুব অন্যমনস্ক। কী যেন খুব মন দিয়ে ভাবছেন। হুঁ-হাঁ করে উত্তর দেন। মাঝে মাঝে এমন একটি দুটি কথা বলেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ক'টা নাকি ক্যাং আছে খুব সুন্দর, যাবেন সেখানে?

সফদর আলী বললেন, হুঁ।

খুব চমৎকার নাকি একটা বৌদ্ধমূর্তি আছে সেখানে।

হ্যাঁ।

চলুন যাই, এদিক দিয়ে মাইলখানেক গেলেই নাকি পৌঁছে যাব।

হুঁ।

সময় আছে তো, কয়টা বাজে এখন?

হ্যাঁ।

সফদর সাহেব কয়টা বাজে এখন?

হুঁ।

গলা উঁচিয়ে আমাকে বলতেই হল, কয়টা বাজে এখন, আমার হাতে ঘড়ি নেই।

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, ও আচ্ছা! ছোট ট্রান্সমিটার তো ওভারলোডেড হয়ে যায়।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

রাতে যখন শোওয়ার ব্যবস্থা করছি তখন মতিন এসে হাজির। সকালবেলা খবর পেয়ে হেরোইন ল্যাবরেটরিতে হানা দিতে গিয়েছিল, কোনো লাভ হয় নি। ওরা যখন পৌঁছেছে তখন পুরো দল হাওয়া, এবারেও আগে থেকে খবর পেয়ে গেছে। আমরা আমাদের ডিটেকটিভ কাজের খবর দিলাম মতিনকে, পুলিশের জিপকে যেতে দেখে কী ভাবে সারাদিন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রেখেছি খুলে বললাম। শুনে মতিন খুশ হল কি না বোঝা গেল না। পুলিশে চাকরি করলে এই অসুবিধে, এক জন মানুষ নিরপরাধী শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।

তিনজন বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। আমার তখন আবার সফদর আলীকে ভয় দেখানোর কথাটা মনে পড়ে গেল। ভূতের ভয় দেখানোর জন্যে মতিনকে রাজি করানো যায় কি না ভাবলাম। কলেজে থাকতে ভারি পাজি ছিল! এখন হোমরাচোমরা মানুষ হয়ে ভদ্র হয়ে গেছে কি না কে জানে। মতিন যখন উঠে পড়ে আমি সফদর আলীকে বললাম, আপনি শুয়ে পড়ুন আমি মতিনকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বাইরে এসে আমি মতিনকে ভূতের ভয় দেখানোর কথাটা বললাম, মাঝরাতে তাকে ভূত সেজে এসে সফদর আলীর পিলে চমকে দিতে হবে।

মতিন প্রথমে এককথাতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার আগের রাতের কথা মনে পড়ে যায়। সফদর আলীর স্টান্টগান থেকে কী ভয়ানক ইলেকট্রিক শক—সে সাথে সাথে পিছিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম। কথা দিলাম আমি স্টান্টগানটা লুকিয়ে রাখব। এসব ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই আজ রাতেই করার ইচ্ছা, কিন্তু মতিনকে নাকি রাতে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কাজেই কখন সময় পাবে জানে না। ঠিক করা হল পরের রাতে সে আসবে। ঠিক একটার সময়। হাত দুটো উঁচু করা থাকবে পুরোটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। দেখে মনে হবে আট ফুট উঁচু একটা দানব। একবার সফদর আলীর বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবে, বাকি দায়িত্ব আমার।

ঘরে ফিরে এসে দেখি সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি সফদর আলী তখনো ঘুমে। আমি বাথরুমে গোসল ইত্যাদি সেরে এসে দেখি সফদর আলী উঠে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, আমরা ধরে রেখেছি খবরটা ওয়্যারলেসে যায়, কিন্তু আসলে হয়তো এটা পাঠানো হয় লেজার দিয়ে। খুবই তো সহজ। একটা ভালো আয়না, একটা ফটো ডায়োড একটা ভালো এমপ্লিফায়ার, ব্যাস তাহলেই হয়। সফদর আলী ভুরু কুঁচকে থেমে গেলেন তারপর গোঁফ টানতে টানতে বললেন, দিনের বেলা অবশ্যি মুশকিল—এতো আলোতে লেজার লাইটকে দেখা যাবে? কী মনে হয় আপনার?

আমি আর কী বলব? সফদর আলীকে ওভাবে চিন্তিত অবস্থায় বসিয়ে রেখে বের হয়ে এলাম। হোটেলের মালিক আজকেও অলস ভঙ্গিতে একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়টা কবুতর, হাতের ওপর একটা। কবুতরগুলো মানুষকে ভয় পায় না, আজকে আমাকে দেখে একটা আমার হাতের ওপর এসে বসে। কয়টা দানা তুলে নিতেই খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। হোটেলের মালিকের সাথে আরো একটা দুটো কথা হল। অলস প্রকৃতির লোক, বাইরে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে দেখি না।

সফদর আলী গোসল ইত্যাদি সেরে আসার পর দু'জন বেরিয়ে পড়লাম। সারাটা দিন ঘুরতে ঘুরতে কেটে গেল। অনেক মজার মজার জিনিস দেখার আছে। সব দেখে শেষ করতে পারব কি না সন্দেহ। শুধু মাছের বাজারগুলোই তো ভালো করে দেখতে একমাস লেগে যাবে। বিকেলের দিকে ক্লান্ত হয়ে আমরা ফিরে আসি। ঘরে ঢোকার আগে হঠাৎ ঝটপট করে উড়তে উড়তে হোটেল মালিকের একটা কবুতর নেমে এসে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে বসে। আজ সকালেই এটাকে দানা খাইয়েছি, একদিনেই আমাকে চিনে গেছে। আমি কবুতরটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম—সফদর সাহেব হঠাৎ বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।

কবুতরটিকে তিনি সাবধান হাতে নেন, তখন আমার চোখে পড়ে কবুতরের একটা পায়ে কী সব জিনিস বাঁধা। সফদর সাহেব সেগুলো খুলতে খুলতে বললেন, বোকা কবুতরটা মানুষকে ভয় পায় না, যার কাছে ইচ্ছা চলে যায়। নিশ্চয়ই দুষ্টু কোনো ছেলের হাতে পড়েছিল, দেখেন পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

দুষ্টু ছেলের কাজ! পায়ে ছেঁড়া কাগজ, একটা শিশি, শিশিতে সাবানের গুঁড়া না কী শক্ত করে বাঁধা! আমরা সাবধানে সবকিছু খুলে কবুতরটিকে উড়িয়ে দিই।

রাতে রেস্তরা থেকে খেয়ে আমরা সকাল সকাল ফিরে আসি। আজ রাতে সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখানোর কথা। আগে থেকে একটা ভৌতিক আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। হোটেলে ঢোকার সময় হোটেল মালিকের সাথে দেখা, দেখে মনে হল ভদ্রলোক কিছু একটা নিয়ে যেন একটু দুশ্চিন্তিত, আমাদের দেখে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন। আমি বললাম, আপনার কবুতরগুলো খুব পোষ মেনেছে, মানুষকে মোটে ভয় পায় না।

হোটেল মালিক যে একটু শঙ্কিতভাবে আমাদের দিকে তাকাল, একটু আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, একটু বেশিই পোষ মেনেছে।

আজ বিকেলে উড়ে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে বসেছে।

বিরক্ত করে নি তো আবার?

না, না বিরক্ত কীসের।

সফদর আলী বললেন, আমার মনে হয় আপনার কবুতরকে একটু ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

হোটেল মালিক ভুরু কুঁচকে বললেন, কীসের ট্রেনিং?

এই যেন অপরিচিত মানুষের কাছে না যায়। আজ বিকেলে দেখি কে যেন দুষ্টুমি করে পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

হোটেল মালিক হঠাৎ যেন একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। সফদর আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা খুলে দিয়েছি, আপনার কবুতরের কিছু হয় নি। চমৎকার উড়ে গেল তখন।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম, হোটেল মালিক পিছু পিছু এলেন। ধন্যবাদ জানাতে নিশ্চয়ই। কিছু–একটা বলবেন বলবেন করেও যেন ঠিক বলতে পারলেন না।

ঘরে ঢুকেই আমি ভূতের ভয় দেখানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিই। নিরীহ স্বরে সফদর আলীকে বললাম, হোটেলটা বেশ বড়, কিন্তু মানুষজন কত কম দেখেছেন?

সফদর আলী বললেন, ঠিক করে পাবলিসিটি করে না। নিওন লাইট দিয়ে লিখে দিত—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনার তাই মনে হয়? আজ বাজারে এক জনের সাথে কথা বলছিলাম, সে অন্য কথা বলল।

কি বলল?

বলল বছর দুই আগে নাকি কে এক জন আত্মহত্যা করেছিল এই হোটেলে। সেই থেকে গভীর রাতে কে নাকি হেঁটে বেড়ায়। ভরা পূর্ণিমা হলে নাকি কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে মেরে যায়, আমি হালকা গলায় বললাম, লোকজন

যে কি বাজে কথা বলতে পারে! শুধু শুধু এরকম একটা চমৎকার জায়গার এরকম বাজে একটা বদনাম।

আবহাওয়াটা এর মাঝে ভৌতিক হয়ে গেছে, আমি তার মাঝে আরো একটা দাগা ছেড়ে দিলাম, বললাম, ভূতের ভয় পেলেই ভয়। আমার সেরকম ভয়টয় নেই। তবে হ্যাঁ, আমার এক মামা ভয় পেতেন কিছু বটে! অবশ্যি তার কারণও ছিল।

সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, কি কারণ?

আমি অনেক দিন আগে পড়া একটা ভূতের গল্প মামার গল্প হিসেবে চালিয়ে দিলাম; ভূতের গল্প সবসময় নিজের পরিচিত মানুষের গল্প হিসেবে বলতে হয়, এ ছাড়া ঠিক কাজ করে না। ভেবেছিলাম দুটি গল্প লাগবে, দেখলাম এক গল্পেই কাজ হয়ে গেল। ঘরে লাগানো বাথরুম, সেখানে যাওয়ার সময় সফদর আলী বললেন, ইকবাল সাহেব, দরজার কাছে দাঁড়াবেন একটু, আমি বাথরুম থেকে আসি।

বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানোর পর আমি আমার দ্বিতীয় গল্পটি ফেঁদে বসি। এটাও এক ইংরেজি বইয়ে পড়েছিলাম; স্থান, কাল, পাত্র একটু বদলে আমার দূর সম্পর্কের এক চাচার নিজের জীবনের ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে হল। লাশকাটা ঘরে একটা খুন হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প, বীভৎস ঘটনা বলতে গিয়ে আমার নিজেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সফদর আলীর কথা ছেড়েই দিলাম। মতিন যখন ভূত সেজে আসবে, তখন বাড়াবাড়ি কিছু না একটা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে থাকে। দরজাটা খুলে রেখেছি, রাত একটার সময় আসার কথা, গল্পে গল্পে বেশ রাত হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না।

একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানালাটা কেউ বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে। মতিন এসে গেছে, দরজা খোলা রাখব বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। আমি সফদর আলীকে জাগাব ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলীর ভাঙা গলা শুনতে পেলাম, ভয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। কোনোমতে ফিসফিস করে বললেন, ইকবাল সাহেব, কি কি যেন ঘরে ঢুকছে—

আমি বললাম, চুপ, একটা কথাও না।

মতিন জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। বলেছিলাম, দু'হাত উঁচু করে সাদা কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিতে, কিন্তু মতিন বোকার মতো একটা কাল কাপড় পরে এসেছে, হাত দু'টি তো উঁচু করেই নি, বরং চোরের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ইতিউতি করে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। তাই দেখেই সফদর আলীর প্রায় হার্টফেল করার মতো অবস্থা। হাতড়ে হাতড়ে কোনোমতে ভূতটিপিটা বের করে টিপে দিলেন, সাথে সাথে উচ্চস্বরে আয়াতুল কুরসি পড়া শুরু হয়ে যায়।

মতিন বেচারা গেল ঘাবড়ে। ভীষণ চমকে ওঠে। তারপর দরজার দিকে ছুটে যায় গুলির মতো, কোনোমতে দরজা খুলে এক দৌড়!

হাসির চোটে আমার প্রায় দম বন্ধ হবার মতো অবস্থ। ঘরে আলো জ্বালিয়ে সফদর আলীর সাহস ফিরিয়ে আনি। তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না, ভূতটিপিটা আঁকড়ে ধরে, দুই পা তুলে বিছানায় উবু হয়ে বসে আছেন। তিনি সে রাতে আর আলো নেভাতে দিলেন না, বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে রইলেন।

পরদিন সফদর আলীকে চেনা যায় না, চোখ বসে গিয়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হয় এক রাতে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। আমার তখন খারাপ লাগতে থাকে, ভীতু মানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও হত।

সফদর আলী উঠেই তাঁর ভ্রমণবন্দি গোছাতে শুরু করলেন, এই হোটেলে তিনি আর থাকবেন না। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হল। ভাবছিলাম শুনে বুঝি সফদর আলী খুব রাগ করবেন, কিন্তু উল্টো এত খুশি হয়ে উঠলেন যে বলার নয়। ভূতটুত কিছু নয়, আমি আর মতিন মিলে তাঁকে ভয় দেখিয়েছি ব্যাপারটা তাঁর কাছে এত মজার একটা ঘটনা মনে হতে থাকে যে, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। পেট চেপে ধরে তিনি দুলে দুলে হাসতে থাকেন, আর একটু পরপর বলতে থাকেন, আপনারা তো সাংঘাতিক মানুষ! হিঃ হিঃ হিঃ, আমি আরো ভাবলাম সত্যিকার ভূত, হিঃ হিঃ হিঃ! মতিন সাহেবকে দেখলে মনে হয় কত বড় অফিসার, আর সে কিনা—হিঃ হিঃ হিঃ—সফদর আলী তাঁর কথা শেষ করতে পারেন না।

ব্যাপারটা এত সহজে চুকে গেল দেখে আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী সহজ-সরল মানুষ বলে এত সহজভাবে নিয়েছেন, অন্য কেউ হলে চটে যেত নিঃসন্দেহে। কয়জন মানুষ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করতে পারে? দু'জনে হালকা মন নিয়ে বের হই। আজকেও হোটেল মালিক ইজিচেয়ারে বসে আছেন। কবুতরগুলো পায়ের কাছে বসে দানা খাচ্ছে। আমাদের বের হতে দেখে কেমন জানি বাঁকা করে তাকিয়ে না দেখার ভান করে সামনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, ভদ্রলোকের হয়তো কথা বলার ইচ্ছে নেই, আমরা তাঁকে আর ঘাঁটালাম না।

নাস্তা করে ভাবলাম জেলেপল্লী থেকে ঘুরে আসি। জেলেনৌকা করে সফদর আলীর সমুদ্রে যাবার শখ। ব্যাপারটা আলোচনা করে আসবেন। পথে মতিনের বাসা, ভবলাম একটু দেখা করে যাই। তাকে দেখে গত রাতে সফদর আলী কেমন ভয় পেলেন নিশ্চয়ই জানতে চাইছে। দরজায় টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, দেখি মতিন প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেখে থতমত খেয়ে বলল, তোরা এসেছিস? আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। গলা নামিয়ে বলল, খবর এসেছে আবার, আজ নাকি অনেক বড় দল। রাতে আসব তোদের ওখানে।

সফদর আলী ভূতসংক্রান্ত কী একটা বলতে চাইছিলেন, মতিন তার আগেই আমাকে টেনে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কাল রাতে হঠাৎ হেড অফিস থেকে ফোন, তাই আর সফদর সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে যেতে পারি নি। আজ যাব। তুই আবার অপেক্ষা করে ছিলি না তো?

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল, কিছু বলার আগেই মতিন বলল, এক্ষুনি যেতে হবে, গেলাম আমি।

সফদর আলী এগিয়ে এসে বললেন, কী বললেন মতিন সাহেব?

আমি দুর্বল গলায় বললাম, বলল আজ রাতে সে ভূত সেজে আসবে।

আবার?

না, আবার না, গত রাতে ব্যস্ত ছিল, তাই আসতে পারে নি।

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ঢোক গিলে কোনোমতে বললেন, তার মানে গত রাতে সত্যি ভূত এসেছিল। সর্বনাশ!

আমরা যখন জেলেপল্লীর দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের হোটেল মালিক আর কবুতর। যখন হেরোইন ল্যাবরেটরিতে কাজ চলে, তিনি তাঁর হোটেলের সামনে কবুতর নিয়ে বসে থাকেন, যখন দেখেন পুলিশ যাচ্ছে, তিনি তাঁর কবুতর উড়িয়ে দেন। ট্রেনিং দেয়া কবুতর উড়ে গিয়ে হাজির হয় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। সেখানকার লোকজন দেখেই বুঝে যায় পুলিশ আসছে, তারা সবকিছু গুটিয়ে পালিয়ে যায় নিরাপদ জায়গায়। হেরোইন ল্যাবরেটরির লোকজন যখন হোটেলের মালিকের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চায়, তারা কাগজে লিখে কবুতরের পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দেয়। কবুতর সেটা নিয়ে আসে হোটেল মালিকের কাছে। গতকাল আমরা কবুতরের পা থেকে যেটা খুলে ফেলেছিলাম, সেটা ছিল ওদের পাঠানো কোনো জরুরি খবর। ছোট শিশিতে নিশ্চয়ই কিছু হেরোইন ছিল, বানানো জিনিসটার একটু নমুনা। কাল সেজন্যেই হোটেল মালিক আমাদের মুখে তাঁর কবুতরের গল্প শুনে এত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। রাতে সেজন্যেই হোটেল মালিক এসেছিল আমাদের ঘরে, তাঁর সেই হেরোইনের শিশি উদ্ধার করার জন্যে। সফদর আলীর ভূতটিপি যখন উচ্চৈস্বরে আয়াতুল কুরসী পড়তে শুরু করেছে, তিনি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন।

সফদর আলীকে পুরোটা বোঝাতে একটু সময় লাগল। তিনি ভাবলেন, আমি বলতে চাইছি হোটেল মালিকের কবুতরগুলো আসলে যান্ত্রিক কবুতর, ভেতরে যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝাই। হোটেল মালিক সুইচ টিপে দিয়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দেন, সেগুলো তখন খবর নিয়ে যায় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। এরকম কবুতর বানানো কঠিন বলে তিনি আপত্তি করে যাচ্ছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন আমি বলতে চাইছি কবুতরগুলো সাধারণ দেশি কবুতর এবং এগুলো দিয়েই খবর পাঠানো হয়, সফদর আলী হঠাৎ করে সবকিছু বুঝে গেলেন। খাঁটি ডিটেকটিভদের মতো আমরা সাথে সাথে বুঝে গেলাম আমাদের কি করতে হবে, মতিন তার দলবল নিয়ে রওনা দেবার আগে আমাদের গিয়ে কবুতরগুলোকে আটকাতে হবে।

দু'জনে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম হোটেলে। হোটেল মালিক অলসভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, পায়ের কাছে কবুতরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি সহজ ভঙ্গি করে হোটেল মালিকের কাছে গিয়ে বসি, তখনো অল্প অল্প হাঁপাচ্ছি। সফদর আলী চলে গেলেন কী একটা জিনিস আনতে।

হোটেল মালিক আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, একেবারে হাঁপাচ্ছেন দেখি?

কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে হয়, যেটা মাথায় এল সেটাই বলে ফেললাম, কোনোরকম ব্যায়াম হচ্ছে না, তাই ভাবলাম একটু দৌড়াই। সকালে দৌড়ানো স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ভালো কিনা!

ও!

কবুতরগুলোকে কী ভাবে আটকানো যায় তাই ভাবছিলাম। একটু করে পাখা ছেঁটে দিলে হয়। কিন্তু এত কাছে বসে করি কী করে? এমন সময় সফদর আলী বের

হয়ে এলেন, হাত দেখিয়ে একটা ভঙ্গি করলেন, যার অর্থ তিনি সবকিছু ঠিক করে নিয়েছেন। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এসব ব্যাপারে সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে।

সফদর আলী এসে আমার পাশে বালুর উপর পা ছড়িয়ে বসলেন, হোটেল মালিক তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভদ্রতার কী একটা কথা বললেন। উত্তরে সফদর আলীও কিছু–একটা বলে একটা কবুতরকে আদর করার ভঙ্গিতে তুলে নেন। হোটেল মালিক একটু অন্যদিকে তাকাতেই আঙুলের মাথায় লাগানো কালোমতো ছোট একটা জিনিস কবুতরটার মাথায় টিপে লাগিয়ে দেন। জিনিসটা আঁটালো, মাথার পালকের নিচে ভালোভাবে লেগে যায়, কবুতরটা কোনো আপত্তি করল না, দেখেও বোঝার উপায় নেই।

চারটা কবুতর। হোটেল মালিক কোনটা ব্যবহার করবেন জানি না। তাই একটি একটি করে চারটার মাথাতেই সফদর আলী সেই কালোমতো জিনিসগুলো টিপে লাগিয়ে দিলেন। সেটা কী জিনিস জানি না, কী ভাবে কাজ করবে তাও জানি না, কিন্তু সফদর আলীর উপরে আমার বিশ্বাস আছে। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে বের করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি একটা জিপ–বোঝাই পুলিশ যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। সামনের সিটে মতিনকেও দেখতে পেলাম, সাদা পোশাকে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

জিপটা চলে যেতেই হোটেল মালিক সাদা রঙের একটা কবুতর বাম হাতে তুলে নিলেন। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে ডান হাত দিয়ে কবুতরের সামনে তিন বার চুটকি বাজালেন। নিশ্চয়ই এটা কোনোরকম একটা সংকেত। সত্যি তাই, কবুতরটি তিনটি চুটকি শুনেই হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়, প্রথমে সোজা উপরে, তারপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে। সাংঘাতিক উড়তে পারে পাখিটা, দেখতে দেখতে সেটা মিলিয়ে গেল।

আমরা তিন জনেই তাকিয়ে ছিলাম কবুতরটার দিকে। সফদর আলী অন্যমনস্কভাবে বললেন, খুব ভালো উড়তে পারে কবুতর।

হোটেল মালিক অন্য কবুতরগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, কবুতরের অনেক গুণ।

হ্যাঁ, খেতেও খুব ভালো, আমি যোগ না করে পারলাম না, ভুনা কবুতরের মাংস, খিচুড়ির সাথে গরম ঘি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে।

হোটেল মালিক এবং সফদর আলী, দু'জনেই আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। আমার কথাবার্তায় প্রায় সময়েই খাবারের বিষয় এসে পড়ে। সফদর আলী একটু থেমে বললেন, কবুতরের দিকজ্ঞান খুব ভালো। কখনো রাস্তা হারায় না। যুদ্ধের সময় কবুতর দিয়ে শত্রু অঞ্চল থেকে খবর পাঠানো হত।

হোটেল মালিক অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসলেন। সফদর আলী না দেখার ভান করে বললেন, অনেকদিন বিজ্ঞানীরা জানতেন না কবুতর কী করে দিক ঠিক রাখে। দিন হোক রাত হোক কিছু অসুবিধে হয় না।

হোটেল মালিক একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন জেনেছে?

খানিকটা।

কী ভাবে?

পৃথিবীর যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে সেটা দিয়ে। কম্পাস যেরকম পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে উত্তরদক্ষিণ বুঝতে পারে, কবুতরও সেরকম। কী ভাবে চৌম্বকক্ষেত্রটা বুঝতে পারে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কিন্তু পারে যে, সেটা সবাই জানে।

তাই নাকি? হোটেল মালিকের চোখে–মুখে একটা অবাক হওয়ার ছাপ এসে পড়ে।

হ্যাঁ, খুব সহজ একটা পরীক্ষা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কবুতরের মাথায় একটা ছোট চুম্বক বেঁধে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে অনেক শক্তিশালী। ব্যাস, দেখা গেল কবুতর আর কিছুতেই দিক ঠিক রাখতে পারে না। খুব সহজ একটা পরীক্ষা।

বলতে বলতে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান, কখনো সুযোগ পেলে করে দেখবেন পরীক্ষাটা। ছোট একটা চুম্বক নিয়ে কবুতরের মাথায় লাগিয়ে দেবেন, আমার কাছে আছে একটা, এই যে—সফদর আলী তাঁর আঙুলের ডগায় করে কালো মতন একটা চুম্বক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন।

হোটেল মালিক একটু অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে চুম্বকটি নেন। কী যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। মুখটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে।

আমি বললাম, সফদর সাহেব চলুন যাই, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, চলুন। সফদর আলীও উঠে দাঁড়ালেন।

মস্ত বড় একটা হেরোইন কারবারির দল ধরা পড়ল। হোটেল মালিক ছিল সেই দলের নাটাই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে ভোল পাল্টে। এয়ারপোর্টে ধরা হয়েছে। বর্ডারে প্রায় জনা ত্রিশেক লোক ধরা পড়েছে—কিছু এদেশের কিছু বার্মার। হেরোইন আটক করেছিল প্রায় এক কোটি টাকার মতো। মতিনের অনেক নাম হল সেবার। দুটো নাকি প্রমোশন হয়ে গেছে একবারে। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদেরও খুব নাম হবে। কিন্তু ব্যাপারটা নাকি খুব গোপন। আমাদের নাকি জানার কথাই নয়। তাই আমাদের কথাটা চেপে গিয়েছিল। মতিন বলেছে আমাদের নাকি খুব একপেট খাইয়ে দেবে একদিন। এখনো দেয় নি, অপেক্ষা করে আছি, যদি কিছুদিনের মধ্যে না খাওয়ায়, বলে দেব সবাইকে। কিরকম মাথা খাটিয়ে আমি আর সফদর আলী এত বড় একটা হেরোইন কারবারির দলকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম—কেউ বিশ্বাস করবে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন!

মোরগ

সফদর আলী সাবধানে পকেট থেকে কী একটা জিনিস বের করে আমার হাতে দিলেন। হাতে নিয়ে আমি চমকে উঠি, একটা মাকড়সা। চিৎকার করে আমি

মাকড়সাটাকে প্রায় ছুড়ে ফেলেছিলাম—সফদর আলী হা হা করে উঠলেন, করছেন কি? এটা জ্যান্ত মাকড়সা নয়, ইলেকট্রনিক মাকড়সা।

আমার তখনো বিশ্বাস হয় না। টেবিলের উপর কোনোমতে ফেলে দিই কুৎসিত মাকড়সাটাকে। সেটা ঠিক জ্যান্ত মাকড়সার মতো হেঁটে বেড়াতে থাকে। ঘেন্নায় আমার প্রায় বমি হবার মতো অবস্থা, মাকড়সা আমার ভারি খারাপ লাগে। কেউ যদি বলে একটা ঘরে একটা জ্যান্ত মাকড়সার সাথে থাকবে না একটা জ্যান্ত বাঘের সাথে থাকবে? আমি সম্ভবত বাঘের সাথেই থাকব।

সফদর আলী হাসতে হাসতে বললেন, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এটা ইলেকট্রনিক, দুটো মাইক্রোপ্রসেসর আছে ভেতরে। দু'মাস লেগেছে তৈরি করতে।

দু'মাস খরচ করে একটা মাকড়সা তৈরি করেছেন? আমার বিশ্বাস হয় না, সফদর আলী দু'ঘন্টায় একটা পুরো কম্পিউটার খুলে আবার জুড়ে দিতে পারেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সময় লাগবে না? এইটুকু মাকড়সার শরীরে কতকিছু ঢোকাতে হয়েছে জানেন? পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে লজিক গেট, মাইক্রোপ্রসেসর, র‍্যাম, স্টেপ মোটর, গিয়ার—

এত কষ্ট করে একটা মাকড়সা তৈরি করলেন? একটা ভালো কিছু তৈরি করতে পারতেন, প্রজাপতি বা পাখি। কে মাকড়সা দিয়ে খেলবে?

সফদর আলী একটু আঘাত পেলেন বলে মনে হল। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি ভাবছেন এটা খেলার জিনিস?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তাহলে কি?

কাছে আসেন, আপনাকে দেখাচ্ছি।

আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। তিনি আমার শার্টের ফাঁক দিয়ে মাকড়সাটাকে ঢুকিয়ে দিলেন। সেটা হেঁটে হেঁটে আমার পিঠের উপর এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। যদিও জানি এটা সত্যিকার মাকড়সা নয়, নেহায়েত ইলেকট্রনিক কলকব্জা, তবুও আমার সারা শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। আমি শরীর শক্ত করে দম বন্ধ করে বসে থাকি। মাকড়সাও বসে থাকে চুপ করে। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সফদর আলী বললেন, কিছু হচ্ছে না?

নাহ্।

শরীরের কোনো জায়গা চুলকোচ্ছে না?

নাহ্।

তিনি খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বললেন, আসলে আপনি যদি এমন একটা কাজ করতে থাকেন যে, হাত সরানোর উপায় নেই তাহলে শরীরের কঠিন কঠিন জায়গা চুলকাতে থাকে।

আমি মাথা নাড়লাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু মাকড়সার সাথে শরীর চুলকানোর কী সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সফদর আলীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে বললেন, আপনার হাত দুটি দিন।

আমি হাত দুটি এগিয়ে দিতেই কিছু বোঝার আগে তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত দুটি চেয়ারের হাতলের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী করছেন?

এখন আপনার হাত দুটি বাঁধা। কাজেই শরীরের কোনো জায়গা চুলকালে আপনি চুলকাতে পারবেন না।

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

কাজেই এখন আপনার শরীরের নানা জায়গা চুলকাতে থাকবে। সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, কি, সত্যি বলেছি কি না?

কথাটা সত্যি। ছেলেবেলায় যেদিন রোজা থাকতাম, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ত আজ খাওয়া বন্ধ। সাথে সাথে খিদে লেগে যেত। এবারেও তাই হঠাৎ মনে হতে থাকে ঘাড়ের কাছে একটু একটু চুলকাচ্ছে। সত্যি তাই, চুলকানি বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। অন্যমনস্ক হলে চুলকানি চলে যাবে ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোথায় কি, চুলকানি বাড়তেই থাকে। সফদর আলীকে হাত দুটি খুলে দিতে বলব, এমন সময় হঠাৎ টের পাই মাকড়সাটা ঘাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। হেঁটে হেঁটে যেখানে চুলকাচ্ছে ঠিক সেখানে এসে চুলকে দিতে থাকে। আরামে আমার চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে যখন বাগানে কাজ করে কাদায় হাত মাখামাখি হয়ে যেত, তখন পিঠে কোথাও চুলকালে ভাগনেকে বলতাম চুলকে দিতে। সে কিছুতেই ঠিক জায়গাটা বের করতে পারত না। আমি বলতাম, আরেকটু উপরে, সে বেশি উপরে চলে যেত। বলতাম, আরেকটু নিচে, সে বেশি নিচে চলে যেত। যখন জায়গাটা মোটামুটি বের করতে পারত তখন হয় বেশি জোরে না হয় বেশি আস্তে চুলকে দিত, কিছুতেই ঠিক করে চুলকাতে পারত না। এই মাকড়সাটা অপূর্ব, উপরেও নয়, নিচেও নয়, ঠিক জায়গাটাতে ঠিকভাবে চুলকাতে থাকে। যখন ভাবলাম আরেকটু জোরে হলে ভালো হয় মাকড়সাটা ঠিক আরেকটু জোরে চুলকাতে থাকে, আশ্চর্য ব্যাপার!

সফদর আলী আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন, এবারে হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে একগাল হেসে বললেন, দেখলেন তো এটা কী করতে পারে?

আমার স্বীকার করতেই হল ব্যাপারটা অসাধারণ। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে এটা আদৌ তৈরি করা সম্ভব।

সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবে কাজ করে বুঝেছেন?

আমি কী ভাবে বুঝব?

একটুও বুঝতে পারেন নি? সফদর আলীর একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। এই যে আটটা পা দেখছেন এগুলো হচ্ছে আটটা নার্ভ সেন্সর। শরীরের নার্ভ থেকে এটা কম্পন ধরতে পারে। সেটা থেকে এটা বুঝতে পারে কোথাও চুলকাচ্ছে কি না। যখন বুঝতে পারে, তখন সেটা সেন্ট্রাল সি. পি. ইউ.-তে একটা খবর পাঠায়। সাথে সাথে ফিডব্যাক সার্কিট কাজ শুরু করে দেয়—

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। নিঃসন্দেহে জিনিসটা অসাধারণ। কিন্তু এত কষ্ট করে এরকম একটা জিনিস তৈরি করার সত্যি কি কোনো প্রয়োজন ছিল? সফদর আলীর এত প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কোনো কাজে লাগাতেন, যেটা দিয়ে সাধারণ

মানুষের কোনোরকম উপকার হত—

কী হল? আপনি আমার কথা শুনছেন না, অন্যকিছু ভাবছেন।

না না, শুনছি।

তাহলে বলুন তো স্টেপিং মোটরে কত মাইক্রো সেকেন্ড পরপর টি. টি. এল পাল্‌স্‌ পাঠাতে হয়?

আমি মাথা চুলকে বললাম, শুনেছি মানে তো নয় বুঝেছি। শোনা আর বোঝা কি এক জিনিস?

তার মানে আপনি কিছু বোঝেন নি?

ডিটেলস বুঝি নি, কিন্তু মোটামুটি আইডিয়াটা পেয়েছি।

সফদর আলী পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলে খুলে ধরেন। ভয়ানক জটিল একটা সার্কিট। তার মাঝে এক জায়গায় একটা আঙুল ধরে বললেন, এখান থেকে শুরু করি। আপনি তাহলে বুঝবেন। এই যে দেখছেন—

আমি তাঁকে থামালাম। বললাম, সফদর সাহেব, আমি এসব ভালো বুঝি না, খামোকা আপনার সময় নষ্ট হবে। এর থেকে অন্য একটা জিনিস আলোচনা করা যাক।

কী জিনিস?

এই মাকড়সাটা তৈরি করার প্রয়োজনটা কি?

সফদর আলী খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি ভাবলাম মাকড়সারা কী করে সেটা অন্তত বুঝেছেন। যখন কোনো জায়গায় চুলকাতে থাকে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝেছি। কিন্তু সেটা কি এতই জরুরি জিনিস?

জরুরি নয়? আমি যখন কাজ করি তখন দুটো হাতের দরকার, তার মাঝে যদি কোনো জায়গা চুলকাতে থাকে আমি কী করব?

ঠিক আছে মানলাম, এরা যথেষ্ট জরুরি। কিন্তু এর থেকে জরুরি কোনো জিনিস নেই?

কী আছে? এর থেকে জরুরি কী হতে পারে?

আপনার কাছেই জরুরি হতে হবে সেটা ঠিক নয়। অন্য দশজন মানুষের জন্যে জরুরি হতে পারে। আপনার এরকম প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কাজে লাগান, কত উপকার হত।

কি রকম কাজ?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, গরিব দেশ আমাদের, লোকজন খেতে-পরতে পারে না। যদি গবেষণা করে বের করতেন খাওয়ার সমস্যা কী ভাবে মেটানো যায়, বিশেষ ধরনের ধান, যেখানে চাল বেশি হয় বা বিশেষ ধরনের মাছ, যেটা তাড়াতাড়ি বড় করা যায় আবার খেতেও ভালো। কিংবা গরু-বাছুর বাড়ানোর সহজ উপায়। দুধের এত অভাব! দেশে সব গরিব বাচ্চারা রোগা রোগা, তাদের জন্যে যদি কিছু করতেন। কিংবা সস্তা কাপড় যদি তৈরি করতে পারতেন, সবাই যদি ভদ্র কাপড় পরতে পারত—

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে

বসে থেকে চিন্তিতভাবে নিজের গোঁফ টানতে থাকেন। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করলাম, তিনি হাঁ হাঁ করে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু আলাপে যোগ দিলেন না। আমার তাঁর জন্যে একটু খারাপই লাগে। বেচারা বিজ্ঞানী মানুষ। একটা আশ্চর্য জগতে বাস করেন। সত্যিকার মানুষের জীবন দেখেও দেখেন না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই খুব বিব্রত করে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর যেরকম প্রতিভা—যদি সত্যি সাধারণ মানুষের জন্যে মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বের করেন, খারাপ কী?

পরের সপ্তাহে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে লেখা :

আপনি ঠিক। মাকড়সা চুরমার। খাদ্য গবেষণা।

বিষয়বস্তু পরিষ্কার, আমার কথা ঠিক, তাই তিনি তাঁর মাকড়সাকে চুরমার করে খাদ্যের উপর গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। মাকড়সাটির জন্যে আমার একটু দুঃখ হয়, চুলকানোর এরকম যন্ত্র চুরমার করে ফেলার কি প্রয়োজন ছিল?

পরের সপ্তাহে আরেকটা টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে লেখা :

ডিম। মুরগি। মুরগি ফার্ম। ইনকিউবেটর। কম্পিউটার কন্ট্রোল।

মানে বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না। তিনি মুরগির ফার্ম তৈরি করার কথা ভাবছেন। সেখানে ইনকিউবেটর ব্যবহার করে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। তবে কম্পিউটার ব্যবহার করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ব্যাপারটি আমাকে ঘাবড়ে দিল। একটি মুরগির ফার্ম চালানোর জন্যেদি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে লাভ কি? সফদর আলীর গবেষণা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবার আগে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাগ্য ভালো আমার, সফদর আলী বাসাতেই ছিলেন, জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল, সফদর আলীর কাছে পৌঁছে দিয়ে সে নিজে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে। পাশের টেবিলে খাবার, সামনে টেলিভিশন চলছে, বানরের উপর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই জংবাহাদুরের মুখে একটা পরিষ্কার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি।

সফদর আলীর টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো খাঁচা, সেখানে অনেকগুলো নানা বয়সের মোরগ-মুরগি হেঁটে বেড়াচ্ছে। সফদর আলী গম্ভীর মুখে একটা মুরগির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাতে কাগজ-কলম, মুরগির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে একটু পরপর কী যেন লিখছেন। উঁকি মেরে দেখে মনে হল আধুনিক কবিতা, কারণ তাতে লেখা :

ডান বাম ডান বাম ডান ডান বাম
বাম ডান বাম ডান বাম বাম বাম
বাম বাম ডান বাম বাম ডান বাম...

সফদর আলী খাতা বন্ধ করে বললেন, মোরগের সাথে মানুষের পার্থক্য কি বলেন দেখি?

মাথা চুলকে বললাম, আমরা মোরগকে রান্না করে খাই, মোরগ আমাদের রান্না করে খায় না।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল, খাওয়া ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না।

কথাটা খানিকটা সত্যি, আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

সফদর আলী বললেন, মানুষের দুটি চোখই সামনে। তাই তাদের বাইনোকুলার-দৃষ্টি। কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে তারা দূরত্ব বুঝতে পারে। এক চোখ বন্ধ করে সুইয়ে সুতো পরানোর চেষ্টা করে দেখবেন কত কঠিন। বোঝা যায় না সুইটা কাছে না দূরে। মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, তাই দূরত্ব বুঝতে হলে মোরগকে ক্রমাগত মাথা নাড়তে হয়। একবার ডান চোখে জিনিসটা দেখে, একবার বাম চোখে। বেশিরভাগ পাখিও মোরগের মতো। এজন্যে পাখিরাও মাথা নাড়ে। এই দেখেন আমি লিখছিলাম মোরগ কী ভাবে তার চোখ ব্যবহার করে।

সফদর আলী তাঁর খাতা খুলে দেখালেন। যেটাকে একটা আধুনিক কবিতা ভেবেছিলাম, সেটা আসলে মোরগের মাথা নাড়ানোর হিসেব। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী এখন কবিতা লেখা শুরু করলে ভারি দুঃখের ব্যাপার হত।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি তাঁর মুরগির ফার্ম এবং ইনকিউবেটরের কথা জানতে চাইলাম। সফদর আলী খুব উৎসাহ নিয়ে একটা বড় খাতা টেনে বের করে আনেন। অল্প একটা জায়গায় অনেক মুরগি বড় করার পরিকল্পনা, ইনকিউবেটরে ডিম ফোটানো হবে। ইনকিউবেটর জিনিসটা নাকি খুব সহজ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রেখে তাপমাত্রা বাইশ দিন ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে রাখতে হয়। সফদর আলী তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ ব্যবহারের কথা ভাবছেন, তাহলে তাপমাত্রা ঠিক রাখা নাকি পানির মতো সোজা। তাঁর একটিমাত্র সমস্যা, সেটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। মোরগের বাচ্চার কী ক্ষতি করবে সেটা ঠিক জানেন না। ডিমগুলোকে দিনে দু'বার করে ঘুরিয়ে দেয়া এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে একটা ছোট কম্পিউটার থাকবে। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে ইনকিউবেটর যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্যে একটি ডায়নামোও নাকি বসানো হবে।

আমি সফদর আলীকে থামালাম। বললাম, ইনকিউবেটর তৈরি করে ডিম ফুটিয়ে মোরগের ফার্ম তৈরি করবেন খুব ভালো কথা, কিন্তু সেটা চালানোর জন্যে যদি তেজস্ক্রিয় মৌলিক বা কম্পিউটার লাগে, তাহলে লাভ কী হল? ওসব চলবে না—

কেন চলবে না? সফদর আলী উত্তেজিত হয়ে বললেন, জিনিসটা কত সহজ হয় জানেন? একবার সুইচ অন করে ভুলে যেতে পারবেন।

ভুলে যাওয়ার দরকারটা কী? আমাদের দেশে মানুষের কি অভাব? আমি সফদর আলীকে বোঝানোর চেষ্টা করি, এমনভাবে ইনকিউবেটরটা তৈরি হবে, যেন জিনিসটা হয় সহজ, দাম হয় খুবই কম। ডিম উল্টেপাল্টে দেয়ার জন্যে কম্পিউটার লাগবে কেন? এক জন মানুষ খুব সহজেই দিনে দুইবার করে উল্টে দিতে পারবে। আপনাকে তৈরি করতে হবে জিনিসটার সত্যিকার ব্যবহার মনে রেখে।

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যান, খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। জিনিসটা তৈরি করতে হবে সাধারণ জিনিস দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে।

হ্যাঁ, সম্ভব হলে যেন ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই চালানো যায়, গ্যাস কিংবা কেরোসিন দিয়ে।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একগাল হেসে বললেন, তাহলে তো জিনিসটা তৈরি করা খুবই সহজ। একদিনে বানাতে পারব। ভাবছিলাম ফাইবার গ্লাস

দিয়ে বানাব। কিন্তু তার দরকার নেই। কেরোসিন কাঠ দিয়ে পুরো জিনিসটা তৈরি হবে। দু' প্রস্থ কাঠের মাঝখানে থাকবে ভুসি। তাহলে তাপটা বেরিয়ে যাবে না। গ্যাসের চুলা দিয়ে বাতাসটা গরম করা হবে। বাতাসটা ভেতরে ছড়িয়ে যাবে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গামলায় পানি রাখা হবে। পানি বাষ্পীভূত হয়ে নিজে থেকেই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখবে, যে জিনিসটা একটু কঠিন সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা ঠিক রাখা। একটা ছোট ফিডবাক সার্কিট তৈরি করতে হবে সেজন্যে, সস্তা অপ এম্প দিয়ে বানাব। খরচ পড়বে খুবই কম। ইনকিউবেটরের ভিতরের তাপমাত্রাটা দেখে বাতাসের প্রবাহটাকে বাড়িয়ে না হয় কমিয়ে দেবে। চালানোর জন্যে লাগবে মাত্র দুটো ৯ ভোল্টের ব্যাটারি। কাঠের ট্রেতে ভুষির উপরে থাকবে ডিম, ডিমের কেস তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। একসাথে এক হাজার ডিম ফোটানো যাবে।

ফিডব্যাক সার্কিটের ব্যাপারটা ছাড়া পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে পারলাম। সত্যিই যদি এত সহজে বানানো যায়, তাহলে তো কথাই নেই। সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে, তিনি ঠিক ইনকিউরেটর তৈরি করে দেবেন, যেটা একমাত্র সমস্যা সেটা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস জুড়ে দিতে চান। কী একটা হয়েছে আজকাল, কম্পিউটার ছাড়া কথা বলতে চান না।

ইনকিউবেটর নিয়ে আলোচনা করতে করতে সফদর আলী বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কাগজ বের করে তখন-তখনি জিনিসটা আঁকতে শুরু করেন। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, শুরু করার আগে একটু চা খেলে কেমন হয়?

সফদর আলী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারপর জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একবার আমার দিকে, একবার সফদর আলীর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে চা বানাতে উঠে গেল।

সপ্তাহখানেক খেটেখুটে সফদর আলী তাঁর ইনকিউবেটর তৈরি করলেন। জিনিসটা দেখতে একটা পুরানো সিন্দুকের মতো। কিন্তু সফদর আলীর কোনো সন্দেহ নেই যে এটা কাজ করবে। ইকিউবেটরটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে সফদর আলী একদিন ডিম কিনতে গেলেন। ভাবলাম হয়তো গোটা দশেক ডিম কিনে আনবেন, যদি নষ্ট হয় তাহলে এই দশটা ডিমের উপর দিয়েই যাবে। কিন্তু সফদর আলী সেরকম মানুষই নন, ইনকিউবেটরের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, বাজার ঘুরে ঘুরে তিনি পাঁচ শ' চৌদ্দটা ডিম কিনে আনলেন। পাঁচ শ' বারটা যাবে ইনকিউবেটরের ভেতরে। দুটি সকালের নাস্তা করার জন্যে।

সেদিন বিকেলেই ডিমগুলো ইনকিউবেটরে ঢোকানো হল। ব্যাপারটি দেখার জন্যে আমি অফিস ফেরত সকাল সকাল চলে এলাম। পেন্সিল দিয়ে সফদর আলী সবগুলোর উপর একটি করে সংখ্যা লিখে দিলেন। এতে ডিমগুলোর হিসেব রাখাও সুবিধে, আবার উল্টে দিতেও সুবিধে। সংখ্যাটি তখন নিচে চলে যাবে। ডিমগুলো সাজিয়ে রেখে ইনকিউবেটরের ঢাকনা বন্ধ করে সফদর আলী গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে দিলেন। শোঁ শোঁ করে চুলা জ্বলতে থাকে। দেখতে দেখতে তাপমাত্রা বেড়ে ১০২ পর্যন্ত উঠে সেখানে স্থির হয়ে যায়। এখন এইভাবে বাইশ দিন যেতে হবে। তা হলে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে

বের হবে।

পরের বাইশ দিন আমার খুব উত্তেজনায় কাটে। ইনকিউবেটর কেমন কাজ করছে, সত্যি সত্যি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে কি না এসব নিয়ে কৌতূহল। সফদর আলীর কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা নেই। তিনি জানেন এটা কাজ করবে। বিজ্ঞানী মানুষ, আগে অনেককিছু তৈরি করেছেন, কোনটা কাজ করবে, কোনটা করবে না কী ভাবে জানি আগেই বুঝে ফেলেন। বাইশ দিন পার হওয়ার আগেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে শুরু করে। সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তুলতুলে হলুদ রঙের কোমল গা। কিচকিচ করে ডেকে হৈচৈ শুরু করে দিল। আমি, সফদর আলী আর জংবাহাদুর মহা উৎসাহে বাচ্চাগুলোকে ইনকিউবেটর থেকে বের করে আনতে থাকি। সফদর আলী ওদের রাখার জন্যে ট্রে তৈরি করে রেখেছিলেন। তার উপরে নামিয়ে রেখে সেগুলো উষ্ণ একটা ঘরে রাখা হল। বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে নাকি নানারকম ভাইটামিন আর ওষুধ দেয়া আছে। মোরগের অসুখবিসুখ যেন না হয় সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালের ভেতর পাঁচ শ' তিনটা মোরগছানা কিচকিচ করে ডাকতে থাকে। ছোট ছোট হলুদ রেশমী বলের মতো বাচ্চাগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। নয়টা ডিম নষ্ট হয়েছে, সফদর আলী সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন বলে আলাদা করে রেখেছেন। পাঁচ শ' মুরগির ছানাকে বড় করার দায়িত্ব খুব সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী বুদ্ধি করে আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন বলে রক্ষা। জংবাহাদুর এমনিতেই অলস প্রকৃতির। কিন্তু মোরগের বাচ্চাগুলো দেখাশোনায় তার খুব উৎসাহ। কেউ আশেপাশে না থাকলে সে বাচ্চাগুলোকে হাতে পায়ে ঘাড়ে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বাচ্চাগুলোও এই কয়দিনে জংবাহাদুরকে বেশ চিনে গেছে। দেখলেই কিঁচকিঁচ করে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে।

এই ইনকিউবেটরটাকে কী ভাবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে সফদর আলীর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু সফদর আলী এখন সেটা করতে রাজি না। তিনি বাচ্চাগুলোকে আগে বড় করতে চান। মোরগের বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বড় করার তাঁর কিছু ওষুধপত্র আছে। সেগুলো দিয়ে তাদের বড় করে তুলে যখন ডিম পাড়া শুরু করবে, তখন সেই ডিম দিয়ে আবার বাচ্চা ফোটাতে চান। খুব অল্প জায়গায় কী ভাবে অনেক মোরগকে রাখা যায় সে ব্যাপারেও তিনি একটু গবেষণা করতে চান। সবকিছু শেষ করে পুরো পদ্ধতিটা ইনকিউবেটরের সাথে তার বিলি করার ইচ্ছা।

ভেবে দেখলাম তাঁর পরিকল্পনাটা খারাপ নয়। শুধু ইনকিউবেটরে ডিম ফোটালেই তো হয় না, সেগুলো আবার বড়ও করতে হয়। সেটি ডিম ফোটানো থেকে এমন কিছু সহজ ব্যাপার নয়।

পরের কয়েক সপ্তাহ আমার সফদর আলীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হল। তার প্রয়োজন ছিল। কারণ একা একা কাজ করলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস আমদানি করে ফেলেন। এই এক মাসে আমি তাঁকে যেসব জিনিস করা থেকে বন্ধ করেছি সেগুলো হচ্ছে :

(এক) মোরগের বাচ্চাগুলোর খাবার খুঁটে খেতে যেন অসুবিধে না হয় সেজন্যে তাদের ঠোঁটে স্টেনলেস স্টিলের খাপ পরিয়ে দেয়া।

(দুই) মোরগের বাচ্চাগুলোর অবসর বিনোদনের জন্যে ঘরের দেয়ালে মোরগের উপরে চলচ্চিত্র দেখানো।

(তিন) মোরগের বাচ্চাগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে কি না লক্ষ রাখার জন্যে ঘরে একটা টেলিভিশন ক্যামেরা বসিয়ে দেয়া।

(চার) শীতের সময় মোরগের বাচ্চার যেন ঠাণ্ডা লেগে না যায় সেজন্যে তাদের ছোট ছোট সোয়েটার বুনে দেয়া।

(পাঁচ) যেহেতু তারা মা ছাড়া বড় হচ্ছে, সেজন্যে নিজেদের ভাষা যেন ভুলে না যায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে টেপরেকর্ডারে মোরগের ডাক শোনানো।

(ছয়) বাচ্চাগুলো ঠিকভাবে বড় হচ্ছে কি না দেখার জন্যে প্রত্যেক দিন তাদের ওজন করে গ্রাফ কাগজে ছকে ফেলা।

আমি কোনোভাবে নিঃশ্বাস চেপে আছি। আর দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারলেই বাচ্চাগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠবে। সফদর আলীর নতুন কিছু করার উৎসাহ বা প্রয়োজনও কমে যাবে। বাচ্চাগুলো বেশ তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, পুরো জিনিসটাই একটা বড় ধরনের সাফল্য। আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুর সাথে কথা বলে রেখেছি, জিনিসটাকে একটু প্রচার করে তারপর সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। একটা ছোট ওয়ার্কশপে সপ্তাহে একটা করে ইনকিউবেটর তৈরি করতে পারলেই যথেষ্ট, ব্যবসা তো আর করতে যাচ্ছি না।

ঠিক এই সময়ে আমার হঠাৎ বগুড়া যেতে হল। আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না, কিন্তু বড় সাহেব আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার হিসেবপত্রে কি নাকি গরমিল দেখা গিয়েছে। আমাকে গিয়ে সেটা ধরতে হবে। আমি যখন আপত্তি করছিলাম, তখন বড় সাহেব কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন যে তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। তা ছাড়া অন্য সবাই দায়িত্বশীল সাংসারিক মানুষ। আমার মতো নিষ্কর্মা আর কয়জন আছে যে ঘর-সংসার ফেলে জায়গায়-অজায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে পারে?

যাবার আগে সফদর আলীকে বারবার করে বলে গেলাম তিনি যেন এখন মোরগের বাচ্চাগুলোর ওপর নতুন কোনো গবেষণা শুরু না করেন। বাচ্চাগুলো চমৎকার বড় হচ্ছে, তাদের ঠিক এভাবে বড় হতে দেয়াই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ, আর কিছুই করা উচিত না, তার যত বড় বৈজ্ঞানিক আইডিয়াই আসুক না কেন।

বগুড়া থেকে ফিরে আসতে বেশ দেরি হল। যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম একটি দুটি টেলিগ্রাম হয়তো পাব, কিন্তু কোথায় কি, কোনো খোঁজখবরই নেই। ফিরে এসেই সফদর আলীর বাসায় গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই যথারীতি কুকুরের ডাক, কিন্তু তারপর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি ঘরের দরজায় একটা চিঠি লিখে এলাম যে পরদিন বিকেলবেলা অফিস ফেরত আসব, সফদর আলী যেন বাসায় থাকেন।

পরদিন সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি, দরজায় লাগানো চিঠিটা নেই, যার অর্থ তিনি চিঠিটা পেয়েছেন। আমি দরজায় ধাক্কা দিতেই কুকুরের বদরাগী ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সফদর আলী আমার চিঠি পেয়েও বাসাতে নেই—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! দরজায় বার কয়েক শব্দ করার পর মনে হল একটা জানালা দিয়ে কেউ একজন আমাকে উঁকি মেরে দেখে জানালাটা বন্ধ করে দিল। জংবাহাদুর হতে পারে না, কিন্তু সফদর আলী এরকম করবেন কেন?

আমি পরপর আরো কয়েকদিন চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীকে ধরতে পারলাম না। নিঃসন্দেহে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কেন? আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন কি? আমি মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

সপ্তাহ দুয়েক পর সফদর আলীকে আমি কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় আবিষ্কার করলাম, আমাকে দেখে আবার পালিয়ে না যান সেজন্যে শব্দ না করে একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে ডাকলাম, এই যে সফদর সাহেব।

সফদর আলী চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে গরম চা দিয়ে তিনি মুখ পুড়িয়ে ফেলেন। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমার আবার কিসের খবর, খবর তো সব আপনার কাছে। আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। কয়েক দিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, চিঠি রেখে এসেছিলাম—

ও আচ্ছা, তাই নাকি, এই ধরনের কথাবার্তা বলে তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

আসলে তেমন কিছু গরম নয়, শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলা, আমি সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসি, মোরগের বাচ্চাগুলোর খবর কি?

সফদর আলী না শোনার ভান করে বললেন, নতুন ম্যানেজার এসেছে রেস্তরাঁয়, খুব কড়া, চায়ের কাপগুলো কি পরিষ্কার দেখেছেন?

আমি আরেকবার চেষ্টা করলাম, মোরগের বাচ্চাগুলোর কী খবর, কেমন আছে সেগুলো? কত বড় হয়েছে?

আছে একরকম, বলে সফদর সাহেব কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, টিভি দেখে দেখে জংবাহাদুরের চোখ খারাপ হয়ে গেছে, চশমা নিতে হয়েছে।

বানরের টিভি দেখে চোখ খারাপ হওয়ায় চশমা নিতে হয়েছে, খবরটা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু মোরগের বাচ্চার খবর জানতে চাইলে সেটা না দিয়ে এই খবর দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত কেন? আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে আরো একবার চেষ্টা করলাম, বললাম, সফদর সাহেব, আপনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছেন কেন? মোরগের বাচ্চাগুলো ভালো আছে তো?

সফদর আলী পরিষ্কার আমার কথা না শোনার ভান করে বললেন, ভীষণ চোরের উপদ্রব হয়েছে আজকাল, পাশের বাসা থেকে সবকিছু চুরি হয়ে গেছে।

আমি হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি যদি বলতে না চান আমি তো আর জোর করে বলাতে পারি না। তাঁর আবিষ্কার, তাঁর পরিশ্রম, আমি কোথাকার কে? কিন্তু কী হয়েছে বলতে এত আপত্তি কেন, আমি তো আর তাঁকে খেয়ে ফেলতাম

না। ভারি অবাক কাণ্ড!

সফদর আলী আগের কথার জের টেনে বললেন, চোরটা ভারি পাজি। চুরি করে যা কিছু নিতে পারে নেয়, বাকি সব নষ্ট করে দিয়ে যায়। সেদিন একজনের রান্না করা খাবারে পুরো বাটি লবণ ঢেলে দিয়ে গেছে।

আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকি। সফদর আলী বলতে থাকেন, আগের সপ্তাহে এক বাসা থেকে অনেককিছু ছুরি করে নিয়ে গেছে। যাবার আগে ছোট মেয়েটার পুতুলের মাথাটা ভেঙে দিয়ে গেছে, ভারি পাজি চোর!

আমি সফদর আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, না জানি কি হয়েছে মোরগগুলোর! আমাকে জোর করে চোরের গল্প শোনাচ্ছেন কেন?

সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চোর ধরার একটা যন্ত্র বানাচ্ছি এখন, খুব কায়দার জিনিস হবে। একটা এস. এল. আর. ক্যামেরা জুম লেন্সসহ আছে, আগে ছবি তুলে ফেলবে। চোর ব্যাটা যদি পালিয়েও যায়, তার ছবি তোলা হয়ে যাবে।

সফদর আলী একাই অনেক কথা বলে গেলেন। আমার কথা বলার উৎসাহ নেই। প্রথমে তাঁর ব্যবহারে বেশ দুঃখই লেগেছিল, কিন্তু তাঁকে বেশ অনেকদিন থেকে চিনি। তাই দুঃখটা স্থায়ী হল না। ব্যাপারটা চিন্তা করে আস্তে আস্তে আমি ভারি অবাক হয়ে যাই, পুরো জিনিসটা একটা রহস্যময় ধাঁধার মতো। এই এক মাসে মোরগের বাচ্চাগুলোর কি হতে পারে, যা তিনি আমাকে বলতে চান না? আমার কথা না শুনে মোরগের বাচ্চাগুলোর উপর নিশ্চয়ই কিছু একটা গবেষণা করে পুরো ব্যাপারটি ঘোল পাকিয়েছেন। এখন আমাকে আর সেটা বলতে চাইছেন না। ছোটখাট নয়, বড় ধরনের কিছু। কিন্তু কী হতে পারে? আমাকে বলতে এত আপত্তি কেন?

এভাবে আরো সপ্তাহখানেক কেটে গেল। সফদর আলীর সাথে আজকাল দেখা হয় খুব কম, মোরগের বাচ্চার ব্যাপারটি এভাবে আমার কাছ থেকে গোপন করার পর আমিও নিজেকে একটু গুটিয়ে ফেলেছি। অনেক চেষ্টা করেও জানতে না পেরে আজকাল ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন অফিস ফেরত বাসায় যাবার সময় চায়ের দোকানে উঁকি মেরে দেখি সফদর আলী বসে আছেন। মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ, আমাকে দেখে তাঁর চেহারা আরো কেমন জানি কালো হয়ে গেল। শুকনো গলায় বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমি বললাম, এই তো চলে যাচ্ছে কোনোরকম। আপনার কী খবর? চোর ধরার যন্ত্র শেষ হয়েছে?

আজকাল আমি মোরগের বাচ্চার কথা তুলি না। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ, শেষ তো হয়েছিল।

লাগিয়েছেন চোর ধরার জন্যে?

হ্যাঁ, লাগিয়েছিলাম।

চোর এসেছিল?

সফদর আলী মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

ধরা পড়েছে?

না।

তাহলে জানলেন কেমন করে যে এসেছিল?

সফদর আলী আবার মাথা চুলকে বললেন, জানি এসেছিল, কারণ পুরো যন্ত্রটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আমার একটু কষ্ট হল হাসি গোপন করতে। চোর যদি চোর ধরার যন্ত্র চুরি করে নিয়ে যায় ব্যাপারটাতে একটু হাসা অন্যায় নয়। সফদর আলী আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা দেখে কেমন জানি রেগে উঠলেন, বললেন, আপনি হাসছেন? জানেন আমার কত কষ্ট হয়েছে ওটা তৈরি করতে? কত টাকার যন্ত্রপাতি ছিল আপনি জানেন?

আমি বললাম, কে বলল আমি হাসছি? এটা কি হাসির জিনিস? কী ভাবে নিল চোর এটা?

সফদর সাহেব মাথা চুলকে বললেন, সেটা এখনো বুঝতে পারি নি। জিনিস মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছিল, পুরোটা খুলে নিয়ে গেছে। ভাগ্যিস জংবাহাদুর ছিল, নইলে সব চুরি করে নিত।

জংবাহাদুর কেমন আছে আজকাল?

ভালোই আছে, দিনে দিনে আরো অলস হয়ে যাচ্ছে।

চোখ খারাপ হয়ে চশমা নিয়েছে বলেছিলেন?

হ্যাঁ। মানুষের মতো নাক নেই তো, চশমা পরতে প্রথম প্রথম অনেক ঝামেলা হয়েছিল জংবাহাদুরের।

আমার হঠাৎ জিনিসটা খেয়াল হয়, সত্যিই তো, বানরের চশমা আটকে থাকবে কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবে পরে চশমা?

সফদর আলী একটু হাসলেন, বললেন, সেটা আর কঠিন কী? মোরগের চশমা তৈরি করে দিলাম, আর এটা তো বানর।

আমি চমকে ঘুরে তাঁর দিকে তাকাই, মোরগের চশমা?

সফদর আলী হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

তখন মোটেও গরম পড়ছে না, দু'দিন থেকে আমার হাফহাতা সোয়েটারটা আর শীত মানতে চাইছে না বলে একটা ফুলহাতা সোয়েটার পরব বলে ভাবছি। কাজেই বুঝে নিলাম সফদর আলী কথাটা ঘোরাতে চাইছেন। সফদর আলী ভুলে মোরগের চশমার কথা বলে ফেললেন, এখন আর কিছুতেই মুখ খুলবেন না। আমি তাঁকে আর ঘাঁটালাম না, কথাটা কিন্তু আমার মনে গেঁথে রইল। মোরগের চশমা পরিয়ে তিনি একটা-কিছু অঘটন ঘটিয়েছেন। অঘটনটি কী জানার জন্যে কৌতূহলে আমার পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু লাভ কি? সফদর আলী তো কিছুতেই কিছু বলবেন না।

মাঝরাতে কেউ যদি কাউকে ডেকে তোলে, তার মানে একটা অঘটন। কখনো শুনি নি কাউকে মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হয়েছে সে লটারিতে লাখ-দু' লাখ টাকা পেয়েছে। তাই আমাকে যখন মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হল, আমার সাথে এক জন দেখা করতে এসেছে, ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। কোনোমতে লুঙ্গিতে গিঁট মেরে চোখ মুছতে মুছতে এসে দেখি সফদর আলী। আগে কখনো আমার বাসায় আসেন নি, এই

প্রথম, সময়টা বেশ ভালোই পছন্দ করেছেন। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব, এত রাতে?

রাত কোথায়? এ তো সকাল, একটু পরেই সূর্য উঠে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কথাটা খুব ভুল নয়, ভোর চারটার মতো বাজে, ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলে সূর্য যদি নাও ওঠে, চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবে ঠিকই। এই সময়টাতে আমার ঘুম সবচেয়ে গাঢ়। লাখ টাকা দিলেও এই সময়ে আমি ঘুম নষ্ট করি না। আজ অবশ্যি অন্য কথা, বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো কাজে এসেছেন, না এমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন?

সফদর আলী একটু রেগে বললেন, এমনি হাঁটতে হাঁটতে কেউ এত রাতে আসে নাকি?

আপনিই না বললেন এখন রাত নয়, এখন সকাল। ভাবলাম বুঝি আপনার মর্নিং-ওয়াক করার অভ্যাস।

আরে না না, মর্নিং-ওয়াক না, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

একটু আগে সেই চোর ধরা পড়েছে। এখন তাকে নিয়ে কি করি বুঝতে না পেরে—

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, তাকে সাথে নিয়ে এসেছেন?

না না, কী যে বলেন।

কোথায় সেই চোর?

বাসায়। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, চোর ধরা পড়লে কী কর[illegible] জানেন?

আমি মাথা চুলকাই, চোর ধরা পড়লে লোকজন প্রথমে একচোট মারপিট ক[illegible] নেয় দেখেছি। যাকে সারা জীবন নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ বলে জেনে এসেছি, সেও চোর ধরা পড়লে চোখের সামনে অমানুষ হয়ে কী মারটাই না মারে! কিন্তু সেটা তো আর সফদর আলীকে বলতে পারি না। একটু ভেবে-চিন্তে বললাম, চোর ধরা পড়লে মনে হয় পুলিশের কাছে দিতে হয়।

সে তো সবাই জানে, কিন্তু দেয়টা কী ভাবে? চোর তো আর ওষুধের শিশি না যে পকেটে করে নিয়ে যাব। রিকশায় পাশে বসিয়ে নেব? যদি দৌড় দেয় উঠে?

বেঁধে নিতে হয় মনে হয়।

কোথায় বাঁধব?

হাতে।

হাত বাঁধা থাকলে মানুষ দৌড়াতে পারে না বুঝি?

আমি মাথা চুলকে বললাম, তাহলে মনে হয় পায়ে বাঁধতে হবে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে বললেন, তাহলে ওকে নিয়ে যাব কেমন করে? কোলে করে?

সমস্যা গুরুতর। আমার মাথায় কোনো সমাধান এল না, জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় রেখে এসেছেন?

জংবাহাদুরের কাছে।

আমি অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, একটা বানরের কাছে একটা ঘাগু চোর রেখে এসেছেন! মাথা খারাপ আপনার?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, তাহলে কী করব? সাথে নিয়ে আসব?

কিন্তু তাই বলে একটা বানরের কাছে রেখে আসবেন?

আহা–হা, এত অস্থির হচ্ছেন কেন, আমি কি এমনি এমনি রেখে এসেছি, ঘরের সব দরজা–জানালাতে এখন বিশ হাজার ভোল্ট, পাওয়ার বেশি নেই তাই কেউ ছুঁলে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু দারুণ শক খাবে।

তাই বলেন, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, চোরকে তাহলে আসলে জংবাহাদুরের হাতে ঠিক ছেড়ে আসেন নি।

না, তা ঠিক নয়, জংবাহাদুরের হাতেই ছেড়ে এসেছি। হাই ভোল্টেজের সুইচটা জংবাহাদূরের হাতে, সে ইচ্ছা করলে চালু করবে, ইচ্ছা করলে বন্ধ করবে।

করেছেন কী! আমি লাফিয়ে উঠি, একটা বানরের হাতে এভাবে ছেড়ে আসা উচিত হয় নি। চোর নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে এতক্ষণে।

মনে হয় না, সফদর আলী গম্ভীর গলায় বললেন, জংবাহাদুর ভীষণ চালু, ওকে ধোঁকা দেওয়া মুশকিল।

কি জানি বাবা, আমার বানরের ওপর এত বিশ্বাস নেই। তাড়াতাড়ি চলেন যাই।

আমি দুই মিনিটে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভোরের ঘুমটা গেল, কিন্তু রোজ তো আর চোর ধরা পড়ে না, রোজ তো আর সফদর আলী একটা বানরের হাতে একটা ধড়িবাজ চোর ছেড়ে আসেন না!

ভেবেছিলাম হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। এত সকালে বেচারা রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে কেন কে জানে! আমি রিকশায় উঠে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, নতুন আরেকটা চোর ধরার যন্ত্র তৈরি করেছেন তাহলে?

নাহ্! সফদর আলী হঠাৎ করে কেমন জানি কাঁচুমাচু হয়ে যান।

তাহলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, চোর ধরা পড়ল কেমন করে?

সফদর আলী কাঁচমাচু মুখেই একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, বেচারা চোর ভুল করে সেই মোরগের ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

এই প্রথম তিনি নিজে থেকে মোরগের কথা বললেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি শোনার জন্যে তিনি কী বলেন। কিন্তু সফদর আলী আর কিছুই বললেন না। আমি বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হল?

কী আর হবে, ভয়ে এক চিৎকার করে ফিট।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ে, ভয়ে চিৎকার করে ফিট?

হ্যাঁ।

মোরগ দেখে ফিট?

ও বেচারা কি আর জানে নাকি ওগুলো মোরগ। ও ভেবেছে—

কী ভেবেছে?

কি জানি, কি ভেবেছে। সফদর আলী হাত নেড়ে থেমে পড়তে চাইলেন, কিন্তু আমি চেপে ধরলাম। সফদর আলী বাধ্য হয়ে সবকিছু খুলে বললেন, ঘটনাটা

এরকম—

আমি বগুড়া চলে যাবার পরপরই সফদর আলীর মনে হল ছোট একটা জায়গায় এতগুলো মোরগের বাচ্চা পাশাপাশি থাকাটা তাদের মানসিক অবস্থার জন্যে ভালো নয়। যেহেতু তাদের জন্যে জায়গা বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই তিনি ঠিক করলেন মোরগের বাচ্চাগুলিকে এমন একটা অনুভূতি দেবেন যেন তারা অনেক বড় একটা জায়গায় আছে। ত্রিমাত্রিক সিনেমা দেখানোর জন্যে যেরকম ব্যবস্থা করা হয় তিনিও সেই একই ব্যবস্থা করলেন। ঘরের চারপাশের দেয়ালে গাছপালা–বাড়িঘর ইত্যাদির দুইটি করে ছবি এঁকে দিলেন। একটি লাল রং দিয়ে, আরেকটি সবুজ। ছবি দুটির মাঝখানে একটু ফাঁক রাখা হল, যেখানে ফাঁক যত বেশি, সেখানে ছবিটাকে মনে হবে তত বেশি দূরে। দূরত্বের এই অনুভূতি আনার জন্যে অবশ্যি একটা বিশেষ ধরনের চশমা পরতে হয়। এই চশমার একটা কাচ সবুজ, আরেকটা লাল। এই চশমা পরে লাল আর সবুজ রঙের আঁকা ছবিটির দিকে তাকালে দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা ছবি দেখতে পায়। এক চোখে দেখে লাল রঙে আঁকা ছবি অন্য চোখে দেখে সবুজ রঙে আঁকা ছবি। আমরা কখনোই দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা জিনিস দেখি না। এবারেও মস্তিষ্ক চোখ দুটিকে বাধ্য করে দূরে এক জায়গায় একান্তে যেন দুটি ছবি একত্র হয়ে একটি ছবি হয়ে যায়। কাজেই ছবিটি দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু মনে হয় দূরে। আর তাই দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে মনে হবে অনেক দূরে ছড়ানো।

দেয়ালে ছবি আঁকা শেষ করে সফদর আলী মোরগের চশমা তৈরি শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, মানুষের মতো সামনে নয়। দুই চোখ সামনে না থাকলে দূরত্ব বোঝা যায় না। কাজেই সফদর আলীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সফদর আলী অবশ্যি হাল ছাড়ার মানুষ নন। তাই তিনি একটা সমাধান ভেবে বের করলেন। ছোট ছোট দুটি আয়না তিনি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে চোখের দু' পাশে লাগিয়ে দিলেন। মোরগের এভাবে দেখে অভ্যাস নেই, তাই সেগুলো প্রথম কয়দিন অন্ধের মতো এদিকে–সেদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যখন ডানদিকে যাবার কথা তখন বামদিকে যায়। আবার যখন বামদিকে যাবার কথা তখন যায় ডানদিকে। সপ্তাহখানেক পরে সেগুলোর একটু অভ্যাস হল, তখন একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখা যায়, মোরগগুলো ক্রমাগত মাথা না নেড়ে সবসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সফদর আলীর মতে জিনিসটা দেখতে খুবই অস্বাভাবিক, আগে থেকে জানা না থাকলে ভয় পাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। মোরগের চোখ দুটি সামনের দিকে এনে তাদের বাইনোকুলার দৃষ্টি দেবার পর তিনি তাদের চশমা পরাতে শুরু করলেন। এক চোখে লাল আরেক চোখে সবুজ চশমার কাচে মোরগগুলোকে দেখতে ভয়ংকর দেখাতে থাকে। কিন্তু তারা নাকি দূরত্বের অনুভূতি পাওয়ার ফলে হঠাৎ করে মানসিকভাবে ভালো বোধ করতে শুরু করে। সফদর আলী সেটা কী ভাবে জেনেছেন জিজ্ঞেস করলে মাথা চুলকে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন।

মোরগগুলোর ওপর সফদর আলী আরো কী কী গবেষণা করেছেন সেটা বলে শেষ করার আগেই আমরা তাঁর বাসায় পৌঁছে যাই। সফদর আলী রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দরজার কাছে গিয়ে একটা হাঁক দিলেন, জংবাহাদুর, হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে

দাও, একদম বন্ধ!

জংবাহাদুর নিশ্চয়ই হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ সফদর আলী ইলেকট্রিক শক না খেয়েই ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছু পিছু আমিও ঢুকছিলাম। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ইলেকট্রনিক শক খেয়ে সফদর আলী আর আমি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ি। কয়েক মুহূর্ত লাগে আমার সম্বিৎ ফিরে পেতে। প্রথমেই দেখতে পেলাম ঘুলঘুলিতে জংবাহাদুর ঝুলে আছে। চোখে চশমা এবং সেই অবস্থায় সে পেট চেপে হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সফদর আলী কাপড়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, কেমন পাজি দেখেছেন বেটা বানর?

এইটা আপনার বানর?

গলার স্বরে আমি চমকে তাকাই, খালি গায়ে তেল চিকচিকে একটা মানুষ গালে হাত দিয়ে মেঝেতে বসে অছে। নিশ্চয় চোর হবে, দেখে মনে হয় দিব্যি একটা ভালোমানুষ।

সফদর আলী গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

লোকটা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলল, আমি যদি এই বেটার জান শেষ না করি তাহলে আমার নাম ইদরিস মোল্লা না।

আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলাম, কেন, কি হয়েছে?

জিজ্ঞেস করতে হয় কেন? লোকটা ভীষণ রেগে ওঠে, আপনার পোষা বানর যদি আপনাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মজা দেখায়, তাহলে আমার কী অবস্থা করেছে বুঝতে পারেন না?

সফদর আলী মুখ শক্ত করে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি পালানোর চেষ্টা করেছিলে।

লোকটা মুখ ভেংচে উত্তর দিল, সেটা খুব অন্যায় হয়েছে? আপনি লোক জড়ো করে মারপিট করার ব্যবস্থা করলে দোষ হয় না, আর আমি পালানোর চেষ্টা করলে দোষ?

চোর বেচারা আমাকে দেখে মনে করেছে তাকে পিটুনি দিতে এসেছি। আমার চেহারা এমন যে দেখলেই মনে হয় কাউকে ধরে বুঝি মার দিয়ে দেব। ছোট বাচ্চারা এ জন্যে পারতপক্ষে আমার ধারে–কাছে আসে না। শুনেছি আমার পরিচিত কিছু ছোট বাচ্চাকে আমার কথা বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। যাই হোক, আমি চোরটার ভুল ভেঙে না দিয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে আটকে দিলাম। এখন পুলিশে খবর দিতে হবে। তার সাথে আমার অন্য কৌতূহল রয়ে গেছে। সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, মোরগগুলো কোথায়?

সফদর আলী ইতস্তত করে বললেন, ঐ তো, ঐ ঘরে।

একটু দেখে আসি।

সফদর আলী অনিচ্ছার স্বরে বললেন, যাবেন দেখতে?

কী আছে, দেখে আসি।

সফদর আলী না করলেন না, কিন্তু খুব অস্বস্তি নিয়ে গোঁফ টানতে থাকেন।

আমি দরজা খুলে ঘরটাতে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘর, একটা চাপা দুর্গন্ধ, মোরগের ঘরে যেমন হবার কথা। দেয়াল হাতড়ে বাতির সুইচ না পেয়ে হঠাৎ মনে পড়ল তার বাসায় হাততালি দিলেই বাতি জ্বলে ওঠে। আমি শব্দ করে একটা হাততালি দিলাম

আর সত্যিই সাথে সাথে বাতি জ্বলে উঠল। না জ্বললেই ভালো ছিল, কারণ তখন যে দৃশ্য দেখতে হল, মানুষের পক্ষে সে দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব না।

আমি আতঙ্কে পাথর হয়ে গেলাম। আমার চারদিকে থলথলে আশ্চর্য এক ধরনের প্রাণী। প্রাণীগুলোর গোল গোল বড় বড় চোখ, ড্যাবড্যাব করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণীগুলো আমাকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে, তারপর হঠাৎ একসাথে খাই খাই করে থলথলে শরীর টেনে-হিঁচড়ে আমার দিকে এগুতে থাকে। সফদর আলী মোরগের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এগুলো তো মোরগ নয়, এগুলো সাক্ষাৎ পিশাচ। আতঙ্কে চিৎকার করে আমি পালানোর চেষ্টা করি—তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি সফদর আলী মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছেন। ওপরে চশমা চোখে জংবাহাদুর ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে, আবার সে পেট চেপে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সফদর আলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তখনি বলেছিলাম গিয়ে কাজ নেই, ভয় পেতে পারেন।

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ওগুলো কী?

কেন, মোরগ।

ওরকম কেন?

ভাবলাম মোরগ রান্না করতে হলে যখন পালক ছাড়াতেই হয়। আগে থেকে ওষুধ দিয়ে পালক ঝরিয়ে ফেললে কেমন হয়। পালক ঝরে যাবার পর দেখতে খারাপ হয়ে গেল। তা ছাড়া মোটা হওয়ার ওষুধটা একটু বেশি হয়ে সবগুলো বাড়াবড়ি মোটা হয়ে গেছে। মোটা বেশি বলে খিদেও বেশি, সবসময়েই এখন খাই খাই। যা-ই দেখে তা-ই খেতে চায়, মানুষজন দেখলেও চেষ্টা করে খেতে।

আমি সাবধানে বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিই। কতদিন ঐ দৃশ্য মনে থাকবে কে জানে!

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। চোরকে থানায় দেবার পর তার বাসা থেকে সফদর আলীর চোর ধরার যন্ত্রসহ অনেক চোরাই মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সফদর আলী মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চোর ধরার জন্যে কী একটা পুরস্কার পেতে পারেন বলে শুনেছি। তিনি এখনো গবেষণা করে যাচ্ছেন মোরগগুলোকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে। জিনিসটি অসম্ভব নয়, কিন্তু বেশ নাকি কঠিন। আমি অবশ্যি খুব আশাবাদী নই। তাঁর ইনকিউবেটর অবশ্যি ঠিক আছে। আমি আপাতত সেটাই সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করানো যায় কি না বোঝানোর চেষ্টা করছি।

দেখি কি হয়!

Bigyani Sofdor Alir Moha Moha Abishkar

by

Md. Jafar Iqbal

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com